ফল বাগান স্থাপন (হর্টিকালচার) বিষয়ক
প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

সম্পাদনা

কৃষিবিদ মোহাম্মদ সায়েদুল হক

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)

বাড়ী -১৮, রোড-০৫, ব্লক-এ মিরপুর-০২, ঢাকা-১২১৬।

ফোন ও ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯০০৫৪৫২, ৮৮০-২-৯০১৪৯৩৩,

প্রশিক্ষণ সূচী

দিন	সেসন	বিষয়	সময়	প্রশিক্ষণ পদ্বতি
১ম দিন		নিবন্ধন	৯.০০-৯.৩০	
		উদ্বোধন	৯.৩০-৯.৪৫	
	১	❖ অংশগ্রহণকারীবৃন্দের পরিচিতি ❖ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য ❖ প্রশিক্ষণ কালে করণীয় ও বর্জনীয়	৯.৪৫ -১০.৪৫	বক্তৃতা, লিফলেট, মাল্টিমিডিয়া,
		চা বিরতি	১০.৪৫-১১.১৫	
	২	❖ আইডিএফ পরিচিতি	১১.১৫-১২.১৫	বক্তৃতা, লিফলেট, মাল্টিমিডিয়া,
		❖অংশগ্রহণকারীদের প্রাক মূল্যায়ন	১২.১৫-১.০০	
		দুপুরের খাবার বিরতি	১.০০-২.০০	
	৩	ফল বাগান স্থাপনের সম্ভাবনা	২.০০-৩.০০	
	৪	❖যে সব বিষয় ফল বাগানের উৎপাদনকে প্রভাবিত করে - বাগানের জন্য জমি নির্বাচন - ফল গাছের জাত নির্বাচন - সার প্রয়োগ -সেচ ও নিষ্কাশন - আন্তঃ পরিচর্যা	৩.০০-৪.৩০	বক্তৃতা, লিফলেট মাল্টিমিডিয়া,
		সারাদিনের আলোচনা	৪.৩০-৫.০০	
২ য় দিন		পূর্ব দিনের আলোচনা	৯.০০-৯.৩০	
	৫	কয়েকটি ফল গাছ রোপন ও উৎপাদন পদ্ধতি (পেপে, কলা, নারকেল, আমড়া পেয়ারা, কমলা)	৯.৩০-১১.০০	বক্তৃতা, লিফলেট মাল্টিমিডিয়া,
		চা বিরতি	১১.০০-১১.৩০	
	৬	কয়েকটি ফল গাছ রোপন ও উৎপাদন পদ্ধতি (জাম,আম, কাঁঠাল, লিচু, কুল, কামরাঙ্গা,ডালিম, আনারস)	১১.৩০-১.০০	বক্তৃতা, লিফলেট মাল্টিমিডিয়া,
		দুপুরের খাবার বিরতি	১.০০-২.০০	
	৭	❖বসতবাড়িতে ফল গাছ রোপনে বিবেচ্য বিষয়	২.০০-৪.৩০	বক্তৃতা, লিফলেট,মাল্টিমিডিয়া,
		সারাদিনের আলোচনা	৪.৩০-৫.০০	
৩ য় দিন		পূর্ব দিনের আলোচনা	৯.০০-৯.৩০	
	৮	❖ জৈব সার পরিচিতি ❖ জৈব সার উৎপাদন পদ্ধতি	৯.৩০-১১.০০	বক্তৃতা, লিফলেট মাল্টিমিডিয়া,
		চা বিরতি	১১.০০-১১.৩০	
	৯	❖ জৈব সার ব্যবহার বিধি	১১.৩০-১.০০	বক্তৃতা, লিফলেট, মাল্টিমিডিয়া,
		দুপুরের খাবার	১.০০-২.০০	
	১০	❖ ফল গাছের পোকা দমনে ফেরোমন ফাঁদ, আইপিএম ও আইসিএম বিষয়ে আলোচনা	২.০০-৪.৩০	বক্তৃতা, লিফলেট মাল্টিমিডিয়া,
		সারাদিনের আলোচনা	৪.৩০-৫.০০	

৪ র্থ দিন		পূর্ব দিনের আলোচনা	৯.০০-৯.৩০	
	১১	❖ফল গাছের ক্ষতিকর পতঙ্গ পরিচিতি	৯.৩০-১১.০০	বক্তৃতা, লিফলেট, মাল্টিমিডিয়া,
		চা বিরতি	১১.০০-১১.৩০	
	১২	❖ হাতে তৈরী বিভিন্ন পতঙ্গনাশক এর পরিচিতি তৈরীর পদ্ধতি ও ব্যবহার	১১.৩০-১.০০	বক্তৃতা, লিফলেট, মাল্টিমিডিয়া,
		দুপুরের খাবার বিরতি	১.০০-২.০০	
	১৩	❖ ফলের বিভিন্ন রোগ ও দমন পদ্ধতি	২.০০-৪.৩০	বক্তৃতা, লিফলেট, মাল্টিমিডিয়া,
		সারাদিনের আলোচনা	৪.৩০-৫.০০	
৫ম দিন		পূর্ব দিনের আলোচনা	৯.০০-৯.৩০	
	১৪	ফল গাছের চারা উৎপাদন পদ্ধতি	৯.০০-১১.০০	ব্যবহারিক, মাঠ পরিদর্শন
		চা বিরতি	১১.০০-১১.৩০	
	১৫	ফল গাছ রোপন পদ্ধতি	১১.৩০-১.০০	ব্যবহারিক, মাঠ পরিদর্শন
		দুপরের খাবার বিরতি	১.০০-২.০০	
	১৬	জৈব সার তৈরী পদ্ধতি	২.০০-৪.০০	ব্যবহারিক, মাঠ পরিদর্শন
		প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও সমাপনী	৪.০০-৫.০০	

ভূমিকা

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য দেশের আয়তনের এক-চতুর্থাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন।দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ, জনগণের পুষ্টি ও ভিটামিনের চাহিদা পূরণ, কাঠের চাহিদা মেটানো, রফতানি আয় বৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বনজ বৃক্ষের পাশাপাশি ফল বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচিও অতি গুরুত্বপূর্ণ। বৃক্ষের উপকারিতা অপরিসীম। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খাদ্য চাহিদা, পুষ্টি, শারীরিক বাড়-বাড়তি, মেধার বিকশা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বহুমাত্রিক অবদানের ফলগাছের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখযোগ্য। একজন সুস্থ মানুষের জন্য প্রতিদিন যে পরিমাণ ফল খাওয়া দরকার আমরা অনেকেই সে পরিমাণ খেতে পাই না। তাই নানাবিধ চাহিদা মিটানোর জন্য 'ফল বৃক্ষ রোপণ পক্ষ' বাস্তবায়নের আমাদের প্রত্যেকের সার্বিকভাবে অংশগ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

সেসন নং-১

❖ অংশগ্রহণকারীবৃন্দের পরিচিতি

প্রশিক্ষণের শুরুতেই সকল প্রশিক্ষনার্থীদের সাথে প্রশিক্ষক ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ আন্তরিকভাবে কথা বলে পরিচিত হলে প্রশিক্ষণার্থীদের জড়তা ভেঙ্গে যাবে। তারা তখন মনোযোগ দিয়ে বিষয়গুলি অনুধাবন করতে পারবেন।

❖ প্রশিক্ষণ কালে করণীয় ও বর্জনীয়

১। সঠিক সময়ে ক্লাশে উপস্থিত হওয়া।
২। ক্লাশে আন্তরিক পরিবেশ বজায় রাখা।
৩। একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
৪। পাশাপাশি কথা না বলা।
৫। এক সঙ্গে সবাই বা একাধিক জনে কথা না বলা।
৬। কোন বিষয় না বুঝলে অবশ্যই তা প্রশ্ন করে জেনে নেয়া।
৭। কেউ প্রশ্ন করতে চাইলে তাতে বাঁধা না দেয়া।

সেসন নং-২

❖ **আইডিএফ পরিচিতি ঃ**

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন "আইডিএফ" গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী এন্ড ফার্মস এর সোসাইটিজ ACT XXI OF ১৮৬০ এর অধীনে রেজিষ্ট্রিকৃত এস-১৫৫১(১১১)/৯৩ একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়াও আইডিএফ বাংলাদেশ সরকারের এন.জি.ও বিষয়ক ব্যুরো (নিবন্ধন নম্বর ঃ ৯৪১,তারিখ ২৮/০৫/১৯৯৫ইং) এবং মাইক্রো-ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (সনদ নংঃ-০১৯২০-০১৮৭২-০০২৪৯,তারিখ-১৪/০৫/২০০৮ইং) তে নিবন্ধন প্রাপ্ত। বিনা জামানতে পার্বত্য অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও সুবিধা বঞ্চিত এলাকার জনগণকে ঋণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে দারিদ্রের দুষ্ট চক্র থেকে মুক্ত করতেই এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু। ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে আইডিএফ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কর্মকান্ড শুরু হয় ১৯৯৩ থেকে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী ছাড়াও এ সংস্থা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেনিটেশন, বিশুদ্ধ পানি, উন্নত চুলা, পশু মোটাতাজাকরণ, সৌরশক্তি, মৎস্য ও ভিক্ষুক কর্মসূচী পরিচালনা করছে।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ঢাকা,রাজশাহী, নাটোর, গাজীপুরসহ মোট ১৩ টি জেলায় ৭৮ টি শাখা অফিসের মাধ্যমে অত্র সংস্থা ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী ছাড়াও এ সংস্থা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নত চুলা, পশু মোটাতাজাকরন, সৌরশক্তি, মৎস্য ও ডিগনিটি কর্মসূচী পরিচালনা করছে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর আাওতাধীন জেলা ছাড়াও সৌরশক্তি কর্মসূচী ফেনী, নোয়াখালী, চান্দপুর, কুমিল্লা জেলায় বাস্তবায়ন হচ্ছে ।

আইডিএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব জহিরুল আলম। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে পড়াশোনা কালেই গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের উন্নয়ন কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ও জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থায় চাকুরী শেষে ১৯৯২ সালে দেশে ফিরে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ শুরু করেন। নোবেল বিজয়ী ড ঃ মোহাম্মদ ইউনূস, তাঁর সহকর্মী, শিক্ষক, বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীগণ এ সময়ে তাঁকে এ কাজে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যোগান। ১৯৯৩ সালে গ্রামীণ ট্রাস্টের সহযোগীতায় বান্দরবান জেলার সুয়ালক মৌজায় "সুয়ালক শাখা" শাখার মাধ্যমেই এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়।

সেসন- ৩

ফল বাগান স্থাপনের সম্ভাবনা ঃ

খাদ্য হিসেবে ফলের গুরুত্ব খুব বেশি। আদিকাল থেকেই ফল মানুষের উত্তম খাবার হিসেবে পরিচিত। সেকালে মানুষ যখন কৃষি কাজ শিখেনি, তখন তারা বন জঙ্গলে ঘুরে ফল খেয়ে বেঁচে থাকার প্রধান উপায় ছিল। অধিকাংশ ফলই সুস্বাদু, পুষ্টিকর, মুখরোচক এবং তৃপ্তিদায়ক। ফলে সব ধরনেরই খাদ্য উপাদান রয়েছে। তবে ভিটামিন ও খনিজ লবণের পরিমাণ এতে খুব বেশি। ফল আমরা কাঁচা বা পাকা অবস্থায় সরাসরি খেয়ে থাকি। তাই ফলের ভিটামিন বা খাদ্যমানের অপচয় হয় না, পুরোটাই

দেহের কাজে লাগে। এছাড়া ফল থেকে পাওয়া শ্বেতসার, প্রোটিন ও স্নেহ জাতীয় উপাদানগুলো সহজেই হজম করা যায়। ক্ষুধা বর্ধন ও রোগ নিরাময়ে কোন কোন ফল(পেঁপে, আমলকী, বেদানা ইত্যাদি) অতি উপকারী। ফল থেকে জ্যাম, জেলি, মোরব্বা, স্কোয়াস, চাটনি ইত্যাদি নানা ধরনের মুখরোচক খাদ্য তৈরি করা যায়। দেশে যেসব ফল উৎপাদন হয় তার প্রায় ৬০% ফলন পাওয়া যায় জুন-জুলাই ও আগস্ট মাসে। শীতকালে ফল প্রাপ্তি সুযোগ খুব কম। এজন্য এ সময় সাধারণ মানুষের মাঝে ভিটামিন ও মিনারেলসের অভাব বেশি দেখা যায়। এ কারণে শীতকালে যেসব ফল (কূল, কলা, পেঁপে) উৎপাদন সুবিধা আছে সেগুলোর চাষাবাদে অধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

আগে ফল গাছ লাগানোর প্রতি মানুষের বেশি আগ্রহ ছিল। সুযোগ-সুবিধা থাকলেই অনেকেই বড় বড় ফল বাগান স্থাপন করে আত্মতৃপ্তি পেত। ফল গাছ লাগানো সওয়ারের কাজ, সদকায়ে জারিয়া, এ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধার্মিক ব্যক্তিরা ফল গাছ লাগাতে বেশ তৎপর ছিলেন। পরবর্তীতে জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের ফল বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ অনেকটা কমে গেছে। এছাড়া জ্বালানি ও কাঠের বাজার দর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় সংসারের খরচ মেটাতে গাছ কেটে নগদ অর্থ লাভের প্রতি অনেকেই ঝুঁকে পড়েছে। এতে আমাদের পরিবেশ ও আবহাওয়ায় বিরূপ প্রভাব বাড়ছে। এ অবস্থার উন্নয়নে বেশি করে ফল গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি দেখা দিয়েছে। নতুন ভাবে ৫-৭টা ফল গাছ লাগিয়ে তাকে ফলবান করে না তোলা পর্যন্ত কারো একটি গাছ কাটার অধিকার থাকতে পারে না।

অনেকেই ফল গাছ লাগিয়েই দায়িত্ব শেষ করে। অথচ অন্য ফসলের মতো ফল গাছে সার দেয়া, পানি সেচ-নিকাশ, পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনসহ অন্যান্য পরিচর্যা গ্রহণের মাধ্যমে অধিক ফলন আহরণের গুরুত্ব দেয়া হয় না। এর ফলে গাছ থেকে আশাপদ ফল না পেয়ে অনেকে হতাশ হয়ে পড়ে। অথচ অন্যান্য ফসলের মতো ফল গাছের নিয়মিত যত্ন নিলে অনায়াসে ফলন কয়েক গুণ বাড়ানো যায়। অর্থকরী দিক থেকে ফল চাষ অন্য ফসলের তুলনায় বেশ লাভজনক। একবার ফল বাগান স্থাপন করা হলে পরবর্তীতে খুব একটা পরিশ্রম ও বেশি খরচের প্রয়োজন হয় না। একটু যত্ন নিলে বছরের পর বছর ধরে লাগানো গাছ থেকে আশাপ্রদ ফলন পাওয়া ও লাভবান হওয়া যায়। ফল বাজারজাতকরণেও তেমন সমস্যা নেই। দেশে ও দেশের বাইরে সব খানেই ফলের যথেষ্ট কদর এবংবাজার মূল্য বেশি রয়েছে।

এ অবস্থায় খাদ্য পুষ্টি, ফলের চাহিদা পূরণ, বৃক্ষ সম্পদ বৃদ্ধি, সর্বোপরি পরিবেশ ও আর্থিক উন্নয়নের জন্য বাগান আকারে যার যতটুকু সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা আছে সেখানে বেশি ফল গাছ লাগানোর প্রতি জোর দেয়া আমাদের প্রত্যেকেরই একান্ত দায়িত্ব।

সেসন- ৪

যে সব উপাদান ফল বাগানের উৎপাদনকে প্রভাবিত করে

- বাগানের জন্য জমি নির্বাচন
- ফল গাছের জাত নির্বাচন
- সার প্রয়োগ
- সেচ ও নিষ্কাশন
- আন্তঃ পরিচর্যা

জমি নির্বাচন ও তৈরি :

অধিকাংশ ফলই বহুবর্ষজীবী, এজন্য ফল বাগান স্থাপনে বন্যামুক্ত, পানি সেচ নিকাশ সুবিধা যুক্ত, উঁচু স্থান নির্বাচন প্রয়োজন। দোঁ-আশ ও বেলে দোঁ-আশ মাটি ফল চাষের জন্য বেশি উপযোগী। লোনা ভাবাপন্ন মাটি ফল চাষে অনুপযোগী তবে সফেদা, আমড়া, নারিকেল, বিলাতি গাব, গাব, কাউফল, পেয়ারা, সবরি কলা এসব ফল গাছ কিছুটা লবণাক্ত সহিষ্ণু। যেসব স্থানে পানির স্তর (ওয়াটার টেবিল) অনেকটা কাছাকাছি তথায় গভীর মূল বিশিষ্ট (কাঁঠাল, আম, জাম) ফল চাষে অনুপযোগী। তবে এ ধরনের জমিতে গুচ্ছ মূল বিশিষ্ট (নারিকেল, সুপারি, তাল, খেজুর) এবং স্বল্পমেয়াদি ফল (লেবু, কমলা, পেয়ারা) আবাদ করা যায়। বেশির ভাগ ফল গাছের গোড়ায় সাময়িকভাবে পানি জমে থাকলে গাছ মরে যাওয়ার ভয় থাকে তবে কূল,লিচু, তাল, খেজুর এ ধরনের ফল গাছের প্রতিকূল অবস্থা সহিষ্ণুতা গুণ, কিছুটা আছে। শুরুতেই জমি গভীর ভাবে চাষ দিয়ে মাটি ওলাট-পালট করে আগাছা মুক্ত রেখে জমিকে ১০-১২ দিন রোদ খাওয়ালে অনেকটা পোকামাকড় ও রোগজীবাণু মুক্ত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

বাগান 'লে-আউট', রোপণ দূরত্ব ও মাদা তৈরি :
জমি তৈরি ও প্রাথমিক সার (ব্যাসাল ডোজ) প্রয়োগের পর জমিকে অনেকটা সমান করে নিয়ে যে ধরনের ফল গাছ লাগানো হবে তার জন্য সঠিক দূরত্বে চতুর্ভুজ, আয়তাকার, ত্রিকোনি অথবা ষড়ভূজি পদ্ধতি অবলম্বন করে সঠিক দূরত্বে (লে-আউট করে) নির্ধারিত পয়েন্টে কাঠি পুঁতে গাছ রোপণ পয়েন্ট নির্ধারণ করা দরকার। এরপর তথায় গাছের ধরন ও মাটির প্রকার ভেদে বৃত্তাকার গর্ত তৈরি করে ১০-১২ দিন রেখে তাতে রোদ খাওয়ানোর পর সার ও মাটি মিশিয়ে গর্ত ভরাট করা প্রয়োজন। বড় ধরনের গাছের (আম, কাঁঠাল, লিচু) জন্য রোপণ দূরত্ব হবে প্রায় ৯-১১ মিটার এবং গর্তের মাপ হবে প্রায় ৮৫-৯০ সেমি. চওড়া এবং ৭৫-৮০ সেমি গভীর। মাঝারি ধরনের গাছের (কূল, খাট জাতের আম/নারিকেল, পেয়ারা) জন্য রোপণ দূরত্ব হবে ৫-৬ মিটার এবং গর্তের মাপ হবে চওড়ায় ৭৫-৮০ সেমি. এবং গভীরতায় ৬০-৭৫ সেমি.। ছোট আকারের গাছের (ডালিম, শরিফা, লেবু) জন্য দূরত্ব হবে (৩-৪) মিটার এবং গর্তের মাপ হবে ৬০-৭৫ সেমি. চওড়া এবং ৫০-৬০ সেমি. গভীর। মাটি এঁটেল বা কিছুটা কংকরময় হলে গর্তের মাপ ২৫% বাড়াতে হবে এবং প্রতি গর্তে কমপক্ষে ৪-৫ ঝুড়ি বালি এবং ৪-৫ ঝুড়ি গোবর/কম্পোস্ট মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে।

চারা/কলম সংগ্রহ :
অধিকাংশ ফল গাছই অনেকটা স্থায়ী ধরনের এবং এর ফলন অনেক ক্ষেত্রে ৫০ বছরেরও অধিক কাল পর্যন্ত পাওয়া যায়। এজন্য নিজের তৈরি অথবা জানা-শোনা নার্সারি থেকে উন্নত জাতের চারা/কলম সংগ্রহ করা একান্ত কর্তব্য। বিনামূল্যে পাওয়া গেলেও কোন অনুন্নত বা অজানা জাতের ফল গাছ লাগানো ঠিক নয়। সুস্থ, সবল, ভালো গঠনের, চারা/কলম নির্বাচন করা দরকার। রোগ, পোকায় আক্রান্ত, দুর্বল, কাণ্ড চিকন, বাঁকা-তেড়া, ছায়ায় সংরক্ষিত চারা/কলম কোন মতেই সংগ্রহ করা উচিত হবে না।

রোপণ সময় ও পদ্ধতি :
বর্ষার আগে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস) ফল গাছ লাগানো উত্তম। সেচ ও পানি নিকাশ সুবিধা থাকলে সারা বছরই গাছ লাগানো যায়। বিকাল বেলা গাছ লাগানো ভালো। চারা/কলম লাগানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কোন ক্রমেই গাছের গোড়ায় শিকড়সহ মাটির বলটি ভেঙে না যায়। পলিথিন ব্যাগে চারা/কলম সংরক্ষিত থাকলে পলিব্যাগটি ছুরি বা ব্লেড দিয়ে সাবধানে তা অপসারণ করতে হবে। টব ছাড়ানো অসুবিধা হলে গাছের গোড়ায় মাটি ঠিক রেখে সাবধানে টবটি ভেঙে ফেলা ভালো। চারা/কলমের গোড়ায় যে পর্যন্ত মাটি থাকে গাছ লাগানোর সময় ঠিক ততটুকু মাদায় পুঁতে মাটি দিয়ে ভালোভাবে চেপে সদ্য লাগানো গাছটিকে সোজা ও শক্ত রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। গাছ লাগানোর আগে নিচে থেকে গজানো কিছু অপ্রয়োজনীয় ডাল এবং কিছু পাতা কমিয়ে দেয়া ভালো। ঝড় বাতাসে গাছের গোড়া নড়ে গাছ যেন মারা না যায় এজন্য গাছের গোড়ায় ০৮-১০ সেমি. দূরে একটা শক্ত কাঠি গেড়ে গাছকে সোজা করে বেঁধে রাখা দরকার। গাছ লাগিয়ে গাছের পাতায় ও গোড়ায় পানি দেয়া প্রয়োজন। প্রথম ৫/৭ সপ্তাহ গাছে গোড়ায় ও পাতায় প্রতিদিন পানি দিতে হয়। সম্ভব হলে গাছ লাগানোর প্রথম ৩/৪ সপ্তাহ আধা ছায়া দেয়ার ব্যবস্থা রাখা ভালো।

সার প্রয়োগ :
গাছের ঠিকমতো বৃদ্ধি ও ফলদান ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রতি বছর গ্রীষ্মের প্রারম্ভে (বৈশাখ মাসে) ও বর্ষার শেষে (ভাদ্র মাসে) ফল গাছে নিয়মিত সার প্রয়োগ করা উচিত। গাছের গোড়ার চারদিকের মাটি আলগা করে পরিমাণ মতো জৈব ও রাসায়নিক সার ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। এ সময় মাটিতে রস কম থাকলে সার দেয়ারপর অবশ্যই পানি সেচ দেয়া প্রয়োজন। গাছ লাগানোর ১০-১৫ দিন আগে গর্তের মাটির সাথে জৈব সার, টিএসপি এবং অর্ধেক পরিমাণ পটাশ সার প্রয়োগ করা যেতে পারে (টেবিল-৪)। ইউরিয়া ও বাকি অর্ধেক পটাশ সার গাছ লাগানোর ২-৩ মাস পরে উপরিপ্রয়োগ করা ভালো। অনেকে বয়স্ক গাছের একেবারে গোড়ায় সার প্রয়োগ করে থাকেন। তাতে এ সার গাছের তেমন উপকারে আসে না। কেননা, সার গ্রহণে সম শিকড় (রুট হেয়ার) বড় গাছের গোড়া থেকে বেশ দূরে (গাছের প্রকার ভেদে ১-৪ মিটার) থাকে। এজন্য দুপুর বেলা গাছের নিচে যে পর্যাপ্ত ছায়া পড়ে, গোড়া থেকে সে অংশ পর্যন্ত মাটি ভালোভাবে কুপিয়ে সমগ্র অংশে সার প্রয়োগ করা উচিত। গাছের গোড়া থেকে কিছু দূরে (যে পর্যন্ত গাছের ছায়া পড়ে তার মাঝ বরাবর) বৃত্তাকারে ৩০ সেমি. চওড়া এবং ১৫-২৫ সেমি. গভীর করে তৈরি নালায় সার সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে ভরাট করে সেচ দেয়া প্রয়োজন। গাছ প্রতি সার প্রয়োগ পরিমাণ নির্ভর করে জমির উর্বরতা শক্তির ওপর। উর্বর মাটিতে অপেক্ষাকৃত কম এবং অনুর্বর মাটিতে বেশি পরিমাণ সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সব বয়সের গাছের সারের চাহিদার পরিমাণ সমান নয়। গাছ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারের চাহিদার পরিমাণ বাড়তে থাকে। গাছ লাগানোর সময় মাদায় যে পরিমাণ সার প্রয়োগ করা হয় তার চেয়ে পরবর্তী বছরগুলোতে (গাছের প্রকার ভেদে ১ থেকে ৮ বছর পর্যন্ত) প্রতি বছর সার প্রয়োগ পরিমাণ বাড়াতে হয়।

বছর বছর সারের পরিমাণ বাড়ানোর পর শেষ বছরের (৮,৫ বা ৩য় বছর) সুপারিশকৃত সারের ডোজ পরবর্তী বছরগুলোতে অব্যাহত রাখতে হবে। আঁশ জাতীয় (নারিকেল, খেজুর, তাল, সুপারি) গাছে পটাশ জাতীয় সারের চাহিদা বেশি। এজন্য এ

ধরনের গাছের ক্ষেত্রে পটাশ জাতীয় সারের পরিমাণ ৩০% বাড়াতে হবে। বছরে দু'বার সার প্রয়োগের পরিবর্তে ৩ মাস পরপর ৪ বার প্রয়োগ করা উত্তম। এক্ষেত্রে প্রতিবার সুপারিশকৃত ডোজের এক চতুর্থাংশ প্রয়োগ করতে হবে। মে-জুন মাসে প্রতি ফল গাছের গোড়ার চারিদিকে বৃত্তাকার অগভীর নালায় ১০০ গ্রাম দোল চুন/ দোলামাইট (ম্যাগনেশিয়াম + সামান্য ক্যালসিয়াম) এবং ৩০০ গ্রাম সাধারণ চুন (ক্যালসিয়াম) মিশিয়ে গাছের গোড়ার চারিদিকে তৈরি নালায় প্রয়োগে গাছের ম্যাগনেশিয়াম ও ক্যালসিয়ামের চাহিদা মিটাবে। মাটির পিএইচ ৬.৫ বা তার নিম্নে হলে জিপসাম (সালফার) ব্যবহার করলে মাটির অম্লতা আরও বৃদ্ধি পাবে। সে ক্ষেত্রে প্রতি গাছের গোড়ার চারদিকে প্রায় ৪০০ গ্রাম সাধারণ চুন ব্যবহারে মাটির অম্লতা বৃদ্ধি রোধ হবে। অম্ল মাটিতে কতগুলো অনু খাদ্য প্রয়োগ করলে তা গাছ গ্রহণে সক্ষম হয় না। এজন্য বোরন ও দস্তা সার ফোলিয়ার সেপ্র করে অভাব পূরণ করা উচিত হবে।

পানি সেচ ও নিকাশ :

বর্ষাকালে ফল গাছের গোড়ায় যেন পানি না জমে এজন্য নালা কেটে বাড়তি পানি বের করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিশেষ করে পেঁপে, আনারস, কাঁঠাল, আমড়া, ড্রাগন ফল, স্ট্রবেরি এ ধরনের গাছের গোড়ায় পানি জমলে গাছ মারা যাবে। শুকনা মৌসুমে অবশ্য ফল গাছে নিয়মিত পানি সেচ দেয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। মাটিতে রস কমে গেলে নারিকেল, সুপারি, ড্রাগন ফল, পেঁপে, কলা গাছ ঠিকমত বাড়ে না, ফল দান ক্ষমতা কমে যায়। আম গাছে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সেচ দিলে গাছে ফুল ধারণ ব্যাহত হয়। শুকনা মৌসুমে গাছের গোড়া থেকে ৪০-২৩.৫ ইঞ্চি দূর পর্যন্ত বৃত্তাকারে মাটি হালকাভাবে কুপিয়ে লতাপাতা, কচুরিপানা, তুষ, নারিকেলের ছোবড়া, চিনাবাদামের খোসা দিয়ে মালচিং ব্যবস্থা নিলে গোড়ায় ঘাস জন্মে না, রস সংরক্ষিত থাকে, ঘনঘন পানি দেয়ার প্রয়োজন হয় না, পরবর্তীতে এগুলো পচে জৈব সারের কাজ করে, গাছের জন্য পরিবেশ অনুকূল হয়।

পরিচর্যা :

ফল বাগান সবসময় আগাছা মুক্ত রাখা দরকার। পানি দেয়ার ফলে গোড়ার মাটির উপরিভাগ শক্ত হয়ে যায়, মাটিতে বাতাস চলাচল করতে, শিকড় ছড়াতে এবং মাটিতে রস সংরক্ষণ ব্যাহত হয়। এ অবস্থার উত্তোরণে গাছের গোড়ার চারদিক হালকা ভাবে কুপিয়ে মাটি আলগা রাখা প্রয়োজন। গাছ যেন বাতাসে হেলে না পড়ে এ জন্য গাছে খুঁটি দিয়ে সোজা রাখতে হবে।

গাছ ছাটাই করা:

গাছ লাগানোর শুরু থেকেই গাছের গোড়ায় গজানো অতিরিক্ত ডালসহ, রুগ্ন, দুর্বল, অফলন্ত ডাল নিয়মিত ছাঁটাই করে গাছকে সুন্দরভাবে বাড়তে ও আলো বাতাস চলাচল সুবিধা করে দিতে হবে। ছোট আকারের গাছের (লেবু, কমলা) ৫০ সেমি. মধ্যে গোড়ায় গজানো ডাল ছেঁটে গাছের কাঠামো ঠিক করে নেয়া দরকার। অনুরূপভাবে মাঝারি আকারের গাছের (পেয়ারা, বাতাবি লেবু) ৮০ সেমি. মধ্যে এবং বড় ধরনের গাছের (আম) এক মিটারের মধ্যে কাণ্ডে কোন শাখা-প্রশাখা গজাতে দেয়া ঠিক হবে না। বিশেষ করে কাঁঠাল, জাম, আমড়া, গুটি আম এ ধরনের গাছে ৩ মিটারের মধ্যে শাখা কেটে গাছের লম্বা সোজা কাণ্ড তৈরী করা প্রয়োজন। তাতে গাছের টিম্বার ভ্যালু বাড়বে। কূল সংগ্রহের পর এক-দেড় মিটার রেখে সম্পূর্ণ ডাল ছাঁটাই করা অত্যাবশক। তাতে নতুন গজানো ডালে ফুল ফল বেশি ধরে। লিচু সংগ্রহের পর গাছের আগার ৩০ সেমি. ডাল সম্পূর্ণ ছাঁটাই করে দিলে পরের বছর ফল বেশি দিবে। কাঁঠাল গাছের কাণ্ড ও প্রধান ডালগুলো থেকে গাজানো ডাল এবং কাঁঠাল ফলের বোঁটার অবশিষ্ট অংশ বাকল বরাবর ধারাল ছুরি দিয়ে ছেঁটে ফেলতে হবে। এ কাজ কাঁঠাল সংগ্রহের পর আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে সমাধান করা প্রয়োজন। নারিকেল, তাল, খেজুর, সুপারি, কলা গাছের পাতা হলুদ হয়ে শুকানো আরম্ভ হওয়ার আগে সবুজ অবস্থায় কোন মতেই পাতা কাটা ঠিক না। নারিকেল গাছের ছোবড়া পরিষ্কার করে পাতার গোড়ার সাদা অংশ বের করা ঠিক নয়। খেজুর গাছে রস সংগ্রহে যে পরিমাণ কর্তন করা হয় তার মাত্র ২৫% ছিললেই সম পরিমাণ রস পাওয়া যায়। বেশি কাটলে, গাছ বেশি দুর্বল হয়, পরবর্তী বছরে গাছের রস দান ক্ষমতা কমে যায়।

সেসন-৫

কয়েকটি ফল গাছ রোপন ও উৎপাদন পদ্ধতি

পপে, কলা, নারকেল, আমড়া পেয়ারা, কমলা ঃ

পেঁপে

বাংলাদেশে পেঁপে খুব জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ফল। এটা স্বল্পমেয়াদী, ফলই নয় সবজি হিসেবেও এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। পেঁপে অত্যন্ড় সুস্বাদু, পুষ্টিকর এবং ওষুধি গুণসম্পন্ন। বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, রংপুর, নাটোর, যশোর, নরসিংদী, খুলনা এলাকায় বেশি পেঁপে উৎপাদিত হয়। ৬ হাজার হেক্টর জমিতে এর আবাদ হয় এবং মোট উৎপাদন ৪০ হাজার টন। ফলসমূহের মধ্যে পেঁপের চাষ অত্যন্ত লাভজনক।

ওষুধিগুণ

কাঁচা পেঁপেতে প্রচুর পেপেইন নামক হজমকারী দ্রবী থাকে যা রোগীর পথ্য। পাকা পেঁপে ক্যারোজিন সমৃদ্ধ। অজীর্ণ, কৃমি সংক্রমন, আলসার, ত্বকে ঘা, একজিমা, কিডনি সংক্রান্ত জটিলতা, ডিপথেরিয়া, আন্ত্রিক ও পাকস্থলীর ক্যান্সার প্রবুতি রোগ নিরাময়ে কাঁচা পেঁপের পেপেইন ব্যবহার করা হয়। পেঁপের আঠা ও বীজ ক্রিমিনাশক ও প্লীহা যকৃতের জন্য হিতকর।

জাত

বাংলাদেশে অনেক ধরনের পেঁপের চাষ হয়। শাহী পেঁপে একটি উচ্চ ফলনশীল পেঁপের জাত।

জমি নির্বাচন ও তৈরি

উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি ভাল। উপযুক্ত পরিচর্যার দ্বারা প্রায় সব ধরনের মাটিতেই পেঁপের চাষ করা যায়।

রোপণের পদ্ধতি

বাণিজ্যিকভাবে পেঁপে চাষের জন্য বর্গাকার পদ্ধতি অনুসরণীয়।

রোপণের সময়

বর্ষার অতি বর্ষণের সময় বাদ দিয়ে সারা বছর রোপণ করা যায়।

রোপণের দূরত্ব

সারি থেকে সারি মিটার (৬ ফুট) ও চারা থেকে চারা ২ মিটার (৬ ফুট)।

গর্ত তৈরি

গর্তের আকার হবে ৬০ সে.মি. চওড়া ও ৬০ সে. মি. গভীর।

প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ

প্রতি গর্তে ১৫ কেজি বৈজ সার, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম জিপসাম, ২৫ গ্রাম বরিক এসডি এবং ২০ গ্রাম জিংক সালফেট একত্রে ভালভাবে মিশাতে হবে।

চারা তৈরি ও রোপণ

ছোট আকারের ব্যাগে সমপরিমাণ বালি, মাটি ও পচা গোবর ভরে ব্যাগের তলায় ২-৩টি ছিদ্র করতে হবে। তারপর এতে সদ্য সংগৃহীত বীজ হলে ১টি এবং পুরাতন হলে ২-৩টি বীজ বপন করতে হবে। একটি ব্যাগে ১টি চারা রাখতে হয়। চারার বয়স দেড় থেকে ২ মাস হলে প্রতি গর্তে ৩টি করে রোপণ করতে হবে।

সার উপরি প্রয়োগ

প্রতি পেঁপে গাছে ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০০ গ্রাম এমপি সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। চারা লাগানোর পর গাছে নতুন পাতা আসলে ৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম এমপি সার প্রতি এক মাস পরপর প্রয়োগ করতে হবে। গাছে ফুল আসলে এ মাত্রা দ্বিগুণ করতে হয়।

সেচ

চারা রোপণ এবং সার প্রয়োগের পর প্রয়োজনমত পানি দিতে হবে। খরা মৌসুমে ১০-১৫ দিন পরপর হালকা সেচ দিতে হবে। পানি নিকাশ, গাছের গোড়ায় যেন পানি না দাঁড়ায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সারির মাঝকানের নালার মাধমে পানি নিকাশ নিশ্চিত করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

ফুল আসরে ১টি স্ত্রী গাছ রেখে বাকি গাছ তুলে ফেলতে হবে। পরনাগায়নের সুবিধার জন্য বাগনে ১০% পুরুষ গাছ রাখা হয়। ফুল হতে ফল ধরা নিশ্চিত মনে হলে একটি বোঁটায় একটি ফল রেখে বাকিগুলো ছিঁড়ে ফেলতে হবে। গাছ যাতে ঝড়ে না ভাঙ্গে তার জন্য বাঁশের খুঁটি দিয়ে গাছ বেঁধে দিতে হবে।

চলে পড়া রোগ দমন

বর্ষা মৌসুমে পেঁপের ঢলে পড়া রোগে প্রচুর চারা গাছ মারা যায়। তাছাড়া এ রোগের আক্রমণে বর্ষা মৌসুমে কান্ড পচা রোগও হয়ে থাকে। গাছের গোড়ার পানি নিকাশের বাল ব্যবস্থা রাখতে হবে। বীজতালার মাটি ৫% ফরমালডিহাইড দ্বারা জীবাণুমুক্ত করতে হবে। রোগাক্রান্ড় চারা গাছ মাটি হতে উঠিয়ে পুড়ে ফৈলতে হবে। রিডোমিল এম.জেড-৭২ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭ দিন পরপর গাছের গোড়ার চার পাশের মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। জিংকের ঘাটতির জন্য মোজাইক লক্ষণ দেখা দিলে গাছের গোড়ায় গাছপ্রতি ৫-১০ গ্রাম জিংক এবং ০.২% জিংক গাছের পাতায় স্প্রে করতে হবে।

মোজাইক

ভাইরাস জনিত এ রোগের আক্রমণে গাছের পাতা কুঁকড়ে যায়, পাতায় সাদা হলুদে দাগ দেখা যায়, ক্লোরোপ্লাস্ট নষ্ট হয়ে পাতায় ছিট হয় এবং হলদে-সবুজ মোজেইক দাগ পড়ে। আক্রান্ত গাছ দেকা মাত্র ধ্বংস করতে হবে। ভাইরাস বাহক পোকা যেমন জাব পোকা এবং সাদা মাছি পোকা কীটনাশক দ্বারা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পোকামকড় দমন ব্যবস্থা

পেঁপেতে অনিষ্টকারী পোকামাকড় তেমন পরিলক্ষিত হয় না। তবে ভাইরাস বাহক জাব পোকা ও সাদা মাছি পোকার জন্য সুমিথিয়ন/রগর/রক্সিয়ন প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হরে স্প্রে করে দমন করা সম্ভব।

ফল সংগ্রহ

সবজি হিসেবে কচি ফল সংগ্রহ করা যায়। পাকানোর জন্য ফলের ত্বক হালকা হলুদ বর্ণ ধারণ করলে সংগ্রহ করতে হয়।

কলা

কলা বাংলাদেশের একটি উৎকৃষ্ট ফল। এ ফল সারা বছর পাওয়া যায় এবং এটি এমন একটি ফল যা ধনী গরিব সকলেই খাওয়ার সুযোগ পায়। নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, বগুড়া, যশোর, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ, ঠাকুরগাঁও, মেহেরপুর, প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপকভাবে কলার চাষ হয়। বাংলাদেশে প্রায় ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে কলার চাষ হয় এবং ৬ লাখ ২৮ হাজার টন ফল পাওয়া যায়।

জাত

পৃথিবীতে কলার শত শত জাত রয়েছে। তবে চাষাবাদযোগ্য কলার জাতের সংখ্যা কুব বেশি নয়। বাংলাদেশে কলার জাতের মধ্যে সবরি, অমৃতসাগর, চিনিচাম্পা, করবি, জাহাজী উলে-খযোগ্য। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের সর্বত্র চাষের জন্য বারি কলা-১ নামে একটি উন্নত জাত উদ্ভাবন ও মুক্তায়ন করেছে।

জমি নির্বাচন ও তৈরি

পর্যাপ্ত রোদযুক্ত ও পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থাসম্পন্ন উঁচু জমি কলা চাষের জন্য উপযুক্ত। উর্বর দো-আঁশ মাটি কলা চাষের জন্য উত্তম।

রোপণ পদ্ধতি

বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য বর্গাকার ও ষড়ভুজী পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

রোপণের সময়

কলার চারা রোপণের উপযুক্ত সময় হলো– আশ্বিন-কার্তিক (মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য নভেম্বর), মাঘ-ফাল্গুন (মধ্য জানুয়ারি থেকে মধ্য মার্চ) এবং চৈত্র-বৈশাখ (মধ্য মার্চ থেকে মধ্য মে) মাস।

রোপণের দূরত্ব

সারি থেকে সারি ২ মিটার (৬ ফুট) ও গাছ থেকে ২ মিটার।

গর্ত তৈরি

গর্তের আকার ৬০ সে. মি. চওড়া এবং ৬০ সে.মি. গভীর।

প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ

চারা রোপণের মাস খানেক আগেই গর্ত খনন করতে হবে। গর্তে গোবর ১০ কেজি ও টিএসপি ১২৫ গ্রাম মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে।

রোপণ

রোপণের জন্য অসি তেউড় উত্তম। অসি তেউড়ের পাতা সরু, সুচালো এবং অনেকটা অলোয়ারের মত, গুঁড়ি বড় ও শক্তিশালী এবং কান্ড ক্রমশ গোড়া থেকে উপরের দিকে সরু হয়। তিন মাস বয়স্ক সুস্থ সবল তেউড় রোগমুক্ত বাগান থেকে সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণতঃ খাতা জাতের গাছের ৩৫-৪৫ সে. মি. ও লম্বা জাতের গাছের ৫০-৬০ সে. মি. দৈর্ঘ্যের তেউর ব্যবহার করা হয়।

সার প্রয়োগ

প্রতিগর্তে যে হারে সার প্রয়োগ করতে হবে। তাহলো– গোবর/ আবর্জনা পচা সার ১৫-২০ কেজি, টিএসপি ২৫০-৪০০ গ্রাম এমপি ২৫০-৩০০ গ্রাম ইউরিয়া ৫০০-৬৫০ গ্রাম।গোবর সারের ৫০% জমি তৈরির সময় এবং বাকি ৫০% পরবর্তীতে গর্তে দিতে হয়। এ সময় অর্ধেক টিএসপি গর্তে প্রয়োগ করা হয়। রোপণের দেড় থেকে দু'মাস পর ২৫% ইউরিয়া, ৫০% এমপি ও বাকি টিএসপি জমিতে ছিটিয়ে ভালভাবে কুপিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর দু'থেকে আড়াই মাস পর গাছ প্রতি বাকি ৫০% এমপি এবং ৫০% ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। ফুল আসার সময় অবশিষ্ট ২৫% ইউরিয়া জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

সেচ

চারা রোপনের সময় মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা না থাকলে তখনই সেচ দেওয়া উচিত। এছাড়া শুষ্ক মৌসুমে ১৫-২০ দিন অন্তর সেচ দেওয়া দরকার। বর্ষার সময় কলা বাগানে যাতে পানি জমতে না পারে তার জন্য নালা থাকা আবশ্যক।

পানামা রোগ

এটি একটি ছত্রাক জাতীয় মারাত্মক রোগ। এ রোগের আক্রমণে প্রথামে বয়স্ক পাতার কিনারা হলুদ হয়ে যায় এবং পরে কপি পাতাও হলুদ রঙ ধারণ করে। পরবর্তীতে পাতা বোটার কাছে ভেঙ্গে গাছের চতুর্দিকে ঝুলে থাকে এবং মরে যায়। কিন্তু সবচেয়ে কচি পাতাটি গাছের মাথায় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অবশেষে গাছ মরে যায়। কোন কোন সময় গাছ লম্বালম্বিভাবে ফেটেও যায়। আক্রান্ড় গাছ গোড়াসহ উঠিয়ে পুরে ফেলতে হবে।

বানচি-টপ (ভাইরাস রোগ)

এ রোগের আক্রমণে গাছের বৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং পাতা গুচ্ছাকারে বের হয়। পাতা আকারে খাটো, অপ্রশস্থ এবং উপরের দিকে খাড়া থাকে। কচি পাতার কিনারা উপরের দিকে বাকানো এবং সামান্য ফ্যাকাে হলুদ রঙ ধারণ করে। আক্রান্ত গাছ গোড়াসহ উঠিয়ে পুড়ে ফেলতে হবে। গাছ উঠানোর আগে জীবাণু বহনকারী 'জাব পোকা' ও 'থ্রিপস' কীটনাশক ওষুধ দ্বারা দমন করতে হবে। সুস্থ গাছেও কীটনাশক ওষুধ ডেসিস ২.৫ ইসি (১ মিলি/লিটার) স্প্রে করতে হবে।

সিগাটোকা রোগ

এ রোগের আক্রমণে প্রাথমিকভাবে ৩য় ও ৪র্থ পাতায় ছোট ছোট হলুদ দাগ দেখা যায়। ক্রমশ দাগগুওেলা বড় হয় ও বাদামি রঙ ধারণ করে। এভাবে একাধিক দাগ মিলে বড় দাগের সৃষ্টি করে এবং তখন পাতা পুড়ে যাওয়ার মত দেখায়। আক্রান্ত গাছের পাতা পুড়ে ফেলতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি টিল্ট ২৫০ ইসি অথবা ১ গ্রাম ব্যাভিস্টিন মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর গাছে ছিটাতে হবে।

কলা পাতা ও ফলের বিটল পোকা:

কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকা কলার কপি পাতায় হাটাহাটি করে এবং সবুজ অংশ নষ্ট করে। ফলে সেখানে অসংখ্য দাগের সৃষ্টি হয়। কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকা কলার কচি পাতায় হাটাহাটি করে এবং সবুজ অংশ নষ্ট করে। ফলে সেখানে অসংখ্য দাগের সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত আক্রমণে গাছ দুর্বল হয়ে যায়। কলা বের হওয়ার সময় হলে পোকা মোচার মধ্যে ঢুকে কচি কলার উপর হাটাহাটি করে এবং রস চুষে খায়। ফলে কলার গায়ে বসন্ত রোগের মত দাগ হয়। এসব দাগের কারণে কলার বাজার মূল্য কমে যায়। পোকা আক্রান্ত মাঠে বারবার কলার চাষ করে যাবে না। কলার মোচা বের হওয়ার সময় নীল পলিথিন ব্যাগ দ্বারা ঢেকে দিয়ে নিচের দিকে খোলা রাখতে হবে। প্রতি ১ লিটার পানিতে ১ মিলি ডেসিস ২.৫ ইসি মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর ২ বার গাছের পাতার উপরে ছিটাতে হবে অথবা ডায়াজিনন ৬০ ইসি যা লিবাসিড ৫০ ইসি ২ মিলি হারে ব্যবহার করতে হবে।

ফল সংগ্রহ

রোপণের পর ৯-১৪ মাসের মধ্যেই সাধারণত সব জাতের কলা পরিপক্ব এবং সংগ্রহের উপযুক্ত হয়।

নারকেল

নারকেল বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফল। বাংলাদেশের সর্বত্র নারকেল জন্মালেও খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, যশোর এলাকায় এর উৎপাদন আধিক।

বসতবাড়ি, পুকুরপাড়, রাস্তা, স্কুল-কলেজ, মাঠ-ঘাট প্রভৃতির আশপাশে এ গাছ লাগিয়ে বাড়তি আয়ের সংস্থান করা যায়।

ওধুধিগুণ

খাদ্যেপযোগী ডাবের পানিতে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান রয়েছে। বিভিন্ন রকম পেটের গোলযোগে গ্লুকোজ স্যালাইনের বিকল্প হিসেবে ডাবের পানি খুবই উপযোগী। ঘন ঘন পাতলা পায়খানা ও বমির ফলে দেহে যে পানির অভাব ঘটে তা পূরণে ডাবের পানি অত্যন্ত কার্যকরী। এটি পিত্তনাশক ও কৃমিনাশক। ফলের মালা/ আইচা পুড়িয়ে পাথরবাটি চাপা দিয়ে পাথরের গায়ে যে গাম/কাই হয় তা দাদের জন্য মহৌষধ।

জাত

নারিকেলের জাতকে প্রধানত ঃ দু'টো ভাগে ভাগ করা হয়েঠে। যথা লম্বা ও খাটো। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের চাষাবাদের উপযোগী নারিকেলের দুটো জাত যথা-বারি নারিকেল-১ এবং বারি নারিকেল-২ উদ্ভাবন করেছে।

মাটি

নারিকের গাছের জন্য নিকাশযুক্ত দো-আঁশ থেকে পলি দো-আঁশ মাটি উত্তম।

রোপণ

বাগান আকারে নারিকেলের চারা বর্গাকার বা ষড়ভূজী পদ্ধতিতে রোপণ করা ভাল।

রোপণের সময়

মধ্য জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য আশ্বিন চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

রোপণের দূরত্ব

দূরত্ব রাখতে হবে ৬ - ৮ মিটার (২০ - ২৬ ফুট

গর্ত তৈরি

গর্তের আকার মিটার চওড়া ও ১ মিটার গভীর।

প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ

সারের নাম	সারের পরিমাণ
টিএসপি	২৫০ গ্রাম
এমপি	৪০০ গ্রাম
গোবর	১০ কেজি

চারা রোপণ

গর্তে সার মিশানোর১০- ১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে চারা রোপণ করতে হবে এবং প্রয়োজনমত পানি, খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

পরবর্তীতে সার প্রয়োগ

চারার বয়স ৩ মাস হলে ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ফলন্ড় গাছে ১০ বছরের উর্ধ্বে সারের পরিমাণ

সার

সারের নাম	সারের পরিমাণ
ইউরিয়া	১.৫০ কেজি
টিএসপি	১ কেজি
এমপি	১.৭০ ”
জিপসাম	৫০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	২০০ ”

দু'কিস্তিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তির সার মধ্য বৈশাখ থেকে মধ্য জ্যৈষ্ঠ (মে) মাসে এবং ২য় কিস্তির সার মধ্য ভাদ্র থেকে মধ্য আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাসে গোড়া থেকে অন্তত ১.৭৫ মি. দুরে প্রয়োগ করতে হবে। অম্ল মাটিতে ৩ বছর অন্তর এক কেজি চুন প্রয়োগ করা উচিত।

সেচ

শুষ্ক মৌসুমে ১৫ দিন পরপর ২- ৩ বার সেচ দেয়া উত্তম। তবে বর্ষা মৌসুমে পানি নিষ্কাশন দরকার।

ডাব পচা রোগ

ছত্রাক আক্রান্ত অপরিপক্ক ফল গাছ থেকে ঝরে যায়। বর্দো মিশ্রণ (১%) অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড বা কুপ্রাভিউ (২ গ্রাম/লিটার) স্প্রে করতে হবে।

গোবরে পোকা

এ পোকার আক্রমণে শীর্ষ পাতা শুকিয়ে যায়। পূর্ণবয়স্ক পোকা গাছের মাথায় আক্রমণ করে ও পত্রকান্ড ছিদ্র করে ঢুকে ভেতরের কোষকলা খেতে থাকে। বাগান বা গাছের নিচে গোবর বা কম্পোস্টের গাদা রাখতে নেই। আক্রান্ত ডালপালা ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে দিতে হবে। ছিদ্রে লোহার শিক ঢুকিয়ে খুঁচিয়ে পোকা মারা যায়। ছিদ্রে মধ্যে পেট্রোল/কেরোসিন দিয়ে গর্তের মুখ কাদামাটি বা বর্দোপেস্ট দিয়ে বন্ধ করে এ পোকা দমন করা যায়।

ফল সংগ্রহ

ফুল ফোটার ১১-১২ মাস পর ফল সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। কচি অবস্থায় ফলের রঙ সবুজ থাকে। পরিপক্ক অবস্থায় নারকেলের রঙ সবুজ থেকে বাদামী/ খয়েরী রঙ ধারণ করে এবং নারকেলের গায়ে চুলের মত চিকণ দাগ পড়ে।

আমড়া

আমড়া বাংলাদেশের সর্বত্রই বেশ সুপরিচিত ও সমাদৃত। তবে বৃহত্তর বরিশাল ও সাতক্ষীরা এলাকায় এর উৎপাদন সর্বাধিক। আমড়া খেতে খুব সুস্বাদু। বিলেতি আমড়া দিয়ে সুস্বাদু আচার, চাটনি ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

ওষুধি গুণ

এতে ভিটামিন ‘সি’ ছাড়াও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ। আমড়া পিত্ত ও কফ নিবারক, আমনাশক ও কণ্ঠস্বর পরিষ্কারক।অরুচিতে, পিত্তবমনে এর ব্যবহার হয়। দেশীয় আমড়া ছাড়া উন্নতজাতের মধ্যে বারি আমড়া-১ (বারমাসী) নামে একটি উচ্চ ফলনশীল জাত উল্লেখযোগ্য।

মাটি

সুনিষ্কাশিত হলে যে কোন রকমের মাটি আমড়ার জন্য উপযুক্ত। তবে হাল্কা বেলে দো-আঁশ মাটি উত্তম। স্যাঁতসেঁতে জমি আমড়া চাষের অনুপযুক্ত।

বৈশিষ্ট্য

প্রায় সারাবছর ফল ধারন ক্ষমতাসম্পন্ন বারি আমড়া-১ একটি নতুন জাতের আমড়া। এ জাতের আমড়ায় এপ্রিল-মে মাসে ফুল আসা আরম্ভ হয় এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস পর্যন্ত ক্রমাগতফুল আসে। গাছে সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পাকা ফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ গাছে ফুল, গুটি ফল এবং পাকা ফল একই সময়ে পাওয়া সম্ভব। অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস ব্যতিরেকে বছরের দশ মাসেই গাছে ফুল বা ফল পাওয়া যায়। বারি আমড়া-১ জাতের আমড়ায় ১ বছরের চারাই ফুল ও ৫-১০টি ফল আসতে দেখা যায় এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে এর ফলন বৃদ্ধি পায়। একটি চারার বছরের আমড়া গাছে ১২৫-২২৫টি পর্যন্ত আমড়া ধরতে পারে। বারি আমড়া-১ জাতের আমড়ার ফল দেখতে ডিম্বাকার এর আকার দৈর্ঘ্য ৫.৫ সে. মি., প্রস্থ ৪.৫ সে. মি.। ফলের গড় ওজন ৫৫.০ গ্রাম। ফলের শ্বাস হালকা সাদা, মধ্যম রসালো ও টক-মিষ্টি ফলের কোসা পাতলা ও মসৃণ।

রোপণ

আমড়া বর্গাকার বা ষড়ভূজী প্রণালী রোপণ করা যেতে পারে।

রোপণের সময়

জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ মাস চারা রোপণের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। তবে বর্ষার শেষে চারা রোপণ করা যেতে পারে।

রোপণের দূরত্ব

সারি থেকে সরি ৪ মিটার (১৩ ফুট) ও চারা থেকে চারার ৪ মিটার (১৩ ফুট)

গর্ত তৈরি

গর্তের আকার হবে ৬০ সে. মিটার চওড়া ও ৬০ সে. মিটার গভীর।

প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ

প্রতি গর্তে ১০-১৫ কেজি জৈব সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে।

চারা রোপণ

গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা গর্তের মাঝখানে লাগিয়ে প্রয়োজনমত পানি, খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ

চারা রোপণের পর প্রতি বছরই গাছ প্রতি ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি ও ১০০ গ্রাম পটাশ সার প্রয়োগ করা ভাল। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণ ১০% হারে বাড়াতে হবে। একটা ফলন্ড় গাছের জন্য বছরে ২০-২৫ কেজি জৈব সার, ১ কেজি ইউরিয়া, ৮০০ গ্রাম টিএসপি ও ৬০০ গ্রাম পটাশ সার বর্ষার আগে ও পরে প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পর পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

শুকনা মৌসুমে ও ফল ধরার পর মাটির অবস্থা বুঝে ১৫-২০ দিন পরপর সেচ দিলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

ডাই ব্যাক রোগ

পেয়ারার মত দমন করতে হবে।

এ্যান্থ্রাকনোজ

ডালিমের মত দমন করা যায়।

পাতা খেকো পোকা

হলুদ ও বাদামী রঙের ডোরাকাটা পোকা পাতা খেয়ে গাছ দুর্বল করে দেয়। এতে ফলন কমে যায়। লার্ভা অবস্থায় গুচ্ছাকারে থাকার সময় পাতাসহ সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। পোকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে সুমিথিয়ন ৫০ ইসি/লিবাসিড ৫০ ইসি ২ মিলি হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতাসহ পুরো গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। গাছের নিচে পড়ে থাকা সমস্ড় পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ফলসংগ্রহ

ফল বাত্তি হলে সবুজ অবস্থায় সংগ্রহ করতে হবে। গাছ পাকা আমড়া বীজের জন্য ব্যবহার করতে হয়।

পেয়ারা

পেয়ারা একটি দ্রুত বর্ধনশীল গ্রীষ্মকালীন ফল। বাংলাদেশের সর্বত্রই এ ফল জন্মে থাকে। তবে বাণিজ্যিকভাবে বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, চট্টগ্রাম, ঢাকা, গাজীপুর, কুমিল্লা, মৌলভীবাজার, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি প্রভৃতি এলাকায় এর চাষ হয়ে থাকে। দেশে বর্তমানে প্রায় ১০ হাজার হেক্টর জমিতে পেয়ারার চাষ হয় এবং এর মোট উৎপাদন প্রায় ৪৬ হেক্টর।

ওষুধিগুণ

শিকর, গাছের বাকল, পাতা এবং অপরিপক্ক ফল কলেরা, আমাশয় ও অন্যান্য পেটের পীড়া নিরাময়ে ভাল কাজ করে। ক্ষত বা ঘাঁতে থেতলানো পাতার প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়। পেয়ারা পাতা চিবালে দাঁতের ব্যথা উপশম হয়।

জাত

বাংলাদেশে চাষকৃত পেয়ারার জাতের মধ্যে স্বরূপকাঠি, কাঞ্চন নগর ও মুকুন্দপুরী উলে- খযোগ্য। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত দু'টি উন্নত জাত হলো কাজী পেয়ারা, বারি পেয়ারা-২।

জমি নির্বাচন ও তৈরি

নিকাশযুক্ত উর্বর বেলে-দোআঁশ মাটি পেয়ারা চাষের জন্য উত্তম। উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল ও আগাছামুক্ত করে নিতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি

সমতল ভূমিতে বর্গাকার ও ষড়ভুজী এবং পাহাড়ি ভূমিতে কন্টুর।

রোপণের সময়

পেয়ারার চারা সাধারণত : মধ্য জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য আশ্বিন (জুন-সেপ্টেম্বর) মাসে রোপণ করা হয়।

রোপণের গুরুত্ব
সারি থেকে সারি ৬ মিটার (২০ ফুট) ও চারা থেকে চারা ৪ মিটার (১৩ ফুট)।

গর্ত তৈরি
গর্তের আকার হবে ৫০ সে.মি. চওড়া ও ৫০ সে.মি. গভীর।

প্রতি গর্তে সারে পরিমাণ
প্রতি গর্তে যে হারে সার প্রয়োগ করতে হবে তাহলো–গোবর ১৫-২০কেজি, পচা খৈল১-২ কেজি, টিএসপি১৫০-২০০ গ্রাম, এমপি ১৫০-২০০ গ্রাম।

রোপণ
গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর চারাটি গোড়ার মাটির বলসহ গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগাতে হবে। চারা রোপনের পর পানি, খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ
পেয়ারা ফসল থেকে উচ্চ ফলন প্রাপ্তি অব্যাহত রাখতে হরে সে হারে প্রতি গাছে সার প্রয়োগ করতে হবে। পাঁচ বছরে নিচে হলে– গোবর ২০-২৫ কেজি, ইউরিয়া ৩০০-৪০০ গ্রাম, টিএসপি ৩০০-৪০০ গ্রাম, এমপি ৩০০-৪০০ গ্রাম। আর পাঁচ বছরের ওপরে হলে– গোবর ২৫-৩০ কেজি, ইউরিয়া ৫০০-৬০০ গ্রাম, টিএসপি ৪৫০-৫৫০ গ্রাম, এমপি ৪৫০-৫৫০ গ্রাম।

সেচ
খরার সময় ২-৩ বার পানি সেচ দিতে হবে।

ডাল ছঁটাই
পেয়ারা সংগ্রহের পর ভাঙ্গা, রোগাক্রান্ত ও মরা শাখা ছাঁটাই করে ফেলতে হবে। তাতে গাছে আবার নতুন কুঁড়ি জন্মাবে।

ফল পাতলাকরণ
কাজী পেয়ারা ও বাড়ি পেয়ারা-২ জাতের গাছ প্রতিবছর প্রচুর সংখ্যক ফল দিয়ে থাকে। ফল পাতলা না করলে গাছ ভেঙ্গে যায়। তাই মার্কেল আকৃতি হলেই কমপক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ ফল ছাঁটাই করতে হবে। এতে ফরের আকার আকর্ষণীয় হয়।

এ্যানথ্রাকনোজ রোগ
পেয়ারা গাছের পাতা, কান্ড, শাখা-প্রশাখা ও ফল এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। প্রথমে পেয়ারার গায়ে ছোট ছোট বাদামি রংএর দাগ দেখা যায়। দাগগুলো ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে পেয়ারার গাছে ক্ষতের সৃষ্টি করে। আক্রান্ত ফল পরিপক্ব হলে অনেক সময় ফেটে যায়। তাছাড়া এ রোগে আক্রান্ত ফলের শাঁস শক্ত হয়ে যায়। গাছের পরিত্যক্ত শাখা-প্রশাখা, ফল এবং পাতায় এ রাগের জীবাণু বেঁচে থাকে। বাতাস ও বৃষ্টির মাধ্যমে পেয়ারার এনথ্রাকনোজ রোগ ছড়ায়। গাছের নিচে ঝরে পড়া পাতা ও ফল সংগ্রহ করে পুড়ে ফেলতে হবে। গাছে ফল ধরার পর টপসিন-এম প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা টিল্ট-২৫০ প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ৩-৪ বার ভালভাবে স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

ডাই ব্যাক (ডগা মরা)
গাছের কচি ডাল আগা থেকে শুকিয়ে মরে যেতে থাকে। আক্রান্ত ডাল বা ডগা কেটে কাটা অংশে বর্দোপেস্ট ব্যবহার করতে হবে। আক্রান্ত গাছে ডাইথেন এম-৪৫ (০.২%) অথবা বর্দোমিশ্রণ (১%) স্প্রে করতে হবে।

সাদা মাছি পোকা
এ পোকা পাতার নিচের দিকে আক্রমণ করতে রস চুষে খায়। পাতায় সুটিমোল্ড ছত্রাক (কালো রঙ) জন্মে এবং পাতা ঝরে যায়। প্রতি লিটার পানিতে ১০ গ্রাম ডিটারজেন্ট মিশিয়ে ৩ দিন পরপর তিনবার স্প্রে করে এ পোকার আক্রমণের মাত্রা কমানো যেতে পারে।

মাছি পোকা
স্ত্রী মাছি পোকা ফলের খোসার ওপর ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে ক্রীড়া বের হয়ে ফল ছিদ্র করে ভেতরে প্রবেশ করে এবং ফল খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। ফল ছোট অবস্থায় ব্যাগিং করে ফলের মাছি পোকা দমন করা সম্ভব। আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস

করতে হবে। ফল পাকার এক থেকে দেড় মাস পূর্বে থেকেই ডিপটেরেক্স ৮০ এসপি এবং ডেসিস ২.৫ ইসি প্রতি ১০ দিন পরপর দু'বার স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহ

সবুজ থেকে হলদে-সবুজ রঙ ধারণ করলে ফল সংগ্রহের উপযুক্ত হয়।

লেবু

মৌলভীবাজার, সিলেট, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম, রংপুর, পাবনা, রাজশাহী ও পিরোজপুরসহ সব জায়গায় লেবু জন্মে। দেশে প্রায় ৫ হাজার হেক্টর জমিতে ১৩ হাজার টন লেবুর উৎপাদন হয়। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ২-৩ মে.টন।

ওষুধিগুণ

ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ একটি টাক জাতীয় ঃফল। লেবুর রস মধুর সাথে অথবা লেবুর রস লবণ অথবা আদার সাথে মিশিয়ে পান করলে ঠান্ডা ও সর্দি কাশি উপশস হয় এবং ক্ষত শুকায়।

জাত

উন্নতজাত হচ্ছে বারি লেবু-১, বারি লেবু-২ ও বারি লেবু-৩।

মাটি

হালকা দো-আঁশ ও নিকাশ সম্পন্ন মধ্যম অম্লীয় মাটিতে ভাল হঃয়। জমি ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করতে হয়।

রোপণ পদ্ধতি

গুঁটি কলম ও কাটিং তৈরি করে সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা আয়তাকার এবং পাহাড়ি ভূমিতে কন্টুর পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

রোপনের সময়

মধ্য বৈশাখ থেকে মধ্য আশ্বিন চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

রোপণের দূরত্ব

সারি থেকে সারি ২.৫ মিটার (৮ ফুট) ও চারা থেকে চারা ২.৫ মিটার (৮ ফুট)।

গর্ত তৈরি

গর্তের আকার হবে ৬০ সে.মি. চওড়া ও ৬০ সে.মি. গভীর।

গর্তে সারের পরিমাণ

সারের নাম	সারের পরিমাণ
টিএসপি	২৫০ গ্রাম
এমপি	২৫০ গ্রাম
গোবর	১৫ কেজি

রোপণ

গর্ত ভর্তি করার ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে নির্বাচিত চারা সোজাভাবে লাগাতে হবে।

সার প্রয়োগ

সারের নাম	গাছ প্রতি সারের পরিমাণ
ইউরিয়া	৪৫০-৫৫০ গ্রাম
টিএসপি	৩৭৫-৪২৫ গ্রাম
এমপি	৩৭৫-৪২৫ গ্রাম
গোবর	১৫-২০ কেজি

এসব সারের প্রথম কিস্ড়ি মধ্য ভাদ্র থেকে মধ্য কার্তিক, ২য় কিস্ড়ি মধ্য মাঘ থেকে মধ্য ফাল্গুন এবং ৩য় কিস্তি মধ্য জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য আষাঢ় মাসে পরবর্তীতে প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ

খরা মৌসুমে ২-৩ বার সেচ দেয়া দরকার। জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না বিধায় বৃষ্টিপাতের সময় গোছের গোড়ায় যাতে পানি না জমে সে জন্য নালা করে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাল ছাঁটাই

প্রতি বছর মধ্য ভাদ্র থেকে মধ্য কার্তিক মাসে গাছের অবাঞ্ছিত শাখা ছাঁটাই করতে হয়।

ডাইব্যাক

পেয়ারার মত দমন করতে হবে।

গ্যামোসিস

এ রোগের আক্রমণে গাছের কান্ড, ডাল বাদামি রঙ এর হয়ে যায় এবং ডালে লম্বালম্বি ফাটল দেখা দেয় এবং ফাটল থেকে আঁঠা বের হতে থাকে। আক্রান্ড় ডাল কেটে ফেলে অথবা আক্রান্ড় অংশ চেঁছে ফেলে বর্দোপেস্ট ব্যবহার করতে হবে। পানি নিকাশের ব্যবস্থা করা ও সেচের পানি গাছের কান্ডে যাতে না লাগে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

গ্রিনিং

আক্রান্ত পাতা হলুদাভ বর্ণ ধারণ করে যা দেখে দস্তার অভাবজণিত লক্ষণের মত মনে হয়। গাছ দুর্বল হয়ে যায়, বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং ফরন কমে যায়। জ্যৈষ্ঠ থেকে কার্তিক পর্যন্ত প্রতি মাসে একবার কীটনাশক প্রয়োগ করে এ রোগ বিস্তারকারী পোকা সাইলিড বাগ দমন করতে হবে। আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ক্যাংকার

এ রোগের আক্রমণে কচি পাতা, শাখা ও ফলের ধূসর বা বাদিম রঙয়ের গুঁটি বসন্ড়ের মত দাগ পড়ে। লিফ মাইনার পোকা দ্বারা এ রোগ সংক্রমিত হয়। আক্রান্ড় ডগা ও শাখা ছাঁটাই করতে হবে এবং কাটা অংশে বর্দোপেস্ট (১০%) এ প্রলেপ দিতে হবে। প্রতি মাসে বর্দোমিশ্রণ (১%) স্প্রে করতে হবে। ম্যালাথিয়ন অথবা সুমিথিয়ন ১ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে ক্ষত সৃষ্টিকারী পোকা লিফ মাইনার দমন করতে হবে।

পাতার ছোট সুড়ঙ্গ পোকা

এ পোকার ক্ষুদ্রকীড়াগুলো পাতার উপত্বকের ঠিক নিচে আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ করে সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। এতে পাতা কুঁকড়ে বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে ঝরে যায়।

গাছের নতুন পাতা গজানোর সময় রগর/রক্সিয়ন/পারফেকথিয়ন ৪০ ইসি ২ মিলি হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে অথবা ম্যালাথিয়ন/সুমিথিয়ন ১ মিলি হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে।

লেবুর প্রজাপতি পোকা

এ পোকার কীড়া পাতা খেয়ে ফেলে। এজন্য ফল ও গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ডিম ও কীড়াযুক্ত পাতা সংগ্রহগ করে মাটি নিচে পুঁতে বা পুঁড়ে ফেলতে হবে। সুমিথিয়ন ৫০ ইসি/লিবাসিড ৫০ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পরপর প্রয়োগ করতে হবে।

ফল সংগ্রহ

ফল পূর্ণতা প্রাপ্তিহলে তবে সবুজ থাকা অবস্থায় সংগ্রহ করতে হবে।

কমলা

লেবু জাতীয় ফলের মধ্যে বাংলাদেশের কমলা সবচেয়ে জনপ্রিয় ফল। সিলেট (খাশিয়া ও জয়ন্তিয়া) পার্বত্য চট্টগ্রাম (সাজেকভেলী) ও পঞ্চগড় এলাকায় কমলার চাষ হয়। দেশে চারশত হেক্টর জমিতে আবাদ করে এক হাজার টন কমলার উৎপাদন হয়। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ২-৩ মে.টন।

ওষুধিগুণ

এটি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল। কমলা সর্দিজ্বর নিরাময়ে উপকারী। ফলের ছাল বমি নিবারক। ফলের শুষ্ক ছাল অম্লরোগ ও শারীরিক দুর্বলতা নিরসনে উপকারী। ফুলের রস মৃগী রোগ নিবারক।

জাত

বাংলাদেশে 'খাসি ম্যানডারিন' কমলার একটি সুপরিচিত। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বারি কমলা-১ নামে একটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে।

চারা রোপণ

প্রধানত মধ্য বৈশাখ থেকে মধ্য ভাদ্র মাস সময়ের মধ্যে কমলা চারা রোপণ করতে হয়। চারা মাটির বলসহ্ গর্তের মাঝখানে লাগাতে হবে। কলমের চারার জোড়ার স্থানটি মাটি থেকে ১৫ সে.মি. উপরে রাখতে হবে।

সার প্রয়োগ

ভাল ফলন পেতে হলে কমলা গাছে সার প্রয়োগ করা দরকার। মাঘ থেকে মধ্য চৈত্র, মধ্য চৈত্র থেকে মধ্য জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র থেকে মধ্য কার্তিক এ ৩ কিস্তিতে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। চারা রোপণের ৩-৪ মাস পর গাছ প্রতি ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি এবং ১০০ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগহ্ করতে হবে।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রতি গাছের জন্য সারের পরিমাণ নিম্নরূপ হবে–

গাছের বয়স (বছর)	গোবর/কম্পোস্ট	ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি
	(কেজি)	(গ্রাম)	(গ্রাম)	(গ্রাম)
গর্তে	১০-১৫	–	২০০-২৫০	১০০-২০০
৩-৪ মাস	১২-১৫	৮০-১২০	৮০-১২০	৮০-১২০
৫-১২	১২-১৫	৮০-১২০	৮০-১২০	৮০-১২০
১-২ বছর	১২-১৫	৮০-১২০	৮০-১২০	৮০-১২০
২-৩ বছর	১৫-১৮	৩০০-৩৫০	২০০-২৫০	২০০-২৫০
৪-৫ বছর	২০-৩০	৩৫০-৫০০	৩০০-৩৫০	৪৫০-৫০০
৬-৭ বছর	৩৫-৫০	৫৫০-৬৫০	৪০০-৫০০	৪৫০-৫০০

মাটি উর্বরতা এবং গাছের অবস্থা বিবেচনা করে সারের পরিমাণ কমবেশি করা যেতে পারে।

সেচ

চারা গাছের গোঁড়ায় মাঝে মাঝে পানি সেচ দিতে হবে। বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় যাতে বৃষ্টির পানি জমে না থাকে সেদিকে খেয়াল রেখে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাল ছাঁটাই

চারা অবস্থায় কমলা গাছের বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। গোড়া থেকে অতিরিক্ত জন্মানো শাখা গজানোর সাথে সাথে কেটে ফেলতে হবে। নিচের দিকে ছোট শাখা ছেটে মাটি থেকে অন্তত ৪৫সে.মি. ওপর হতে কান্ডের উৎপাদনশীল শাখা বাড়তে দেওয়া যেতে পারে। মরা ও রোগাক্রান্ত ডাল মাঝে মাঝে ছোট দিতে হবে। গাছের গঠন ছোট থেকেই সুন্দর ও শক্ত করে তুলতে হবে।

কমলা গান্ধী (অরেঞ্জ বাগ)

ফলের গাছে ছিদ্র করা রস চুষে খায়। মধ্য ভাদ্র থেকে মধ্য কাতি্ক মাসে যখন ফল পুরু রসালো হয় তখন এ পোকার উপদ্রব শুরু হয়। এতি ছিদ্র স্থান কয়েকদিন পর হলদে হয়ে ফলে ঝরে যায়। সুমিথিয়ন ৫০ ইসি ১০ লিটার পানিতে ৫ চা চামচ মিশিয়ে স্প্রে করলে এ পোকা দমন করা হয়।

ফল সংগ্রহ

কমলা গাছে সাধারণত মধ্য মাঘ থেকে মধ্য। চৈত্র মাসে ফুল আসে এবং মদ্য কার্তিক থেকে মধ্য পৌষ মাসে ফল পাকে। ফলের রঙ কিছুটা হলদে হলে তা সংগ্রহ করা যায়।

সেসন-৬

কয়েকটি ফল গাছ রোপন ও উৎপাদন পদ্ধতি

জাম,আম, কাঁঠাল, লিচু, কুল, কামরাঙ্গা,ডালিম, আনারস ঃ

জাম

আমের পর বাংলাদেশে সুপরিচিত ফল হলো জাম। কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেট, গাজীপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, পাবনা ও টাঙ্গাইল এলাকায় জাম বেশি জন্মে থাকে। জাম তাজা ফল হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এ থেকে সুন্দর রস, স্কোয়াস ও অন্যান্য সংরক্ষিত খাদ্য তৈরি করা যায়।

ওষুধিগুণ

জাম বেশ পুষ্টিকর ফল। জামের কতিপাতা পেটের পীড়া নিরাময়ে সাহায্য করে। জামের বীজ থেকে প্রাপ্ত পাউডার বহুমূত্র রোগের ওষুধ হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। পাকা জাম সৈন্ধব লবন মাখিয়ে ৩-৪ ঘন্টা রেখে চটকিয়ে ন্যাকড়ার পুঁটুলি বেঁধে টানিয়ে রাখলে যে রস বের হয় তা পাতলা দাস্ত, অরুচি ও বমিভাব দূর করে। জাম ও আমের রস একত্রে পান করলে বহুমূত্র রোগীর তৃষ্ণা প্রশমিত হয়।

জাত

ফলের আকার অনুযায়ী দু'ধরনের জাম দেখা যায়। বড় জামকে কালোজাম এবং ছোট জামকে খুদিজাম বলা হয়।

মাটি

সব ধরনের মাটিতে জাম গাছ জন্মে, তবে দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটিতে ভাল জন্মে।

রোপণের সময়

জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ মাস চারা রোপণের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। তবে বর্ষার শেষে চরা রোপণ করা যেতে পারে।

রোপণের দূরত্ব

এজন্য ৮ মিটার-১০ মিটার (২৬-৩২ ফুট)(দূরত্বে চারা রোপণ করা যায়।

গর্ত তৈরি

গর্তের আকার হবে ১ মিটার চওড়া ও ১ মিটার গভীর।

প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ

প্রতি গর্তে মাটির সাথে ১০-১৫ কেজি জৈবসার, ৪-৫ কেজি ছাই ও ২৫০ গ্রাম টিএসপি সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভর্তি করতে হবে।

রোপণ

গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারাটা গর্তের ঠিক মাঝখানে বসিয়ে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ

চারা রোপণের পর প্রতি বছর গাছপতি ১০-১২ কেজি জৈবাসার, ৫০-১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০-৫৯ গ্রাম এমপি প্রয়োগ করতে হবে। গাছ বড় হওয়ার সাথে সাথে প্রতি বছর সারের পরিমাণ ১০% হারে বাড়িয়ে দিতে হবে। পূর্ণ বয়স্ক একটা জাম গাছের জন্য বছরে ৪০-৫০ কেজি জৈবা সার, ১ কেজি ইউরিয়া, ৮০০ গ্রাম টিএসপি ও ৮৭০০ গ্রাম এমপি প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের সময় ও পদ্ধতি আম চাষের মত।

সেচ

চারা গাছে ন ঘন সেচ দিতে হবে। ফল ধরার পর প্রতি ১৫ দিন পরপর ২-৩ বার পানি সেচ দিতে হবে।

ডাল ছাঁটাই

প্রধান কান্ডকে সোজাভাবে কমপক্ষে ১ মিটার বেড়ে উঠার জন্য নিচের শাখা-প্রশাখা ছাঁটাই করতে হবে। ফলন্ত গাছের মরা, দুর্বল, শুকনা ও কীট বা রোগাক্রান্ত ডালপালা নিয়মিত ছাঁটাই করতে হবে।

ফল পচা রোগ

এক প্রকার ছত্রাকের আক্রমণে পাকা ফলে হালকা ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং ফল পচে যায়। আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলতে হবে। ডাইথেন এম-৪৫ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা টিল্ট ২৫০ ইসিন প্রতি লিটার পাপনিতে ০.৫ মিলি লিটার হারে মিশিয়ে বা ১% বার্দোমিকচার ফল ধরার পর থেকে ১৫ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

বিছা পোকা

এ পোকার কীড়া পাতা খেয়ে ফেলে। আক্রান্ত পাতা ছিঁড়ে পোকার গাদাসহ ধ্বংস করতে হবে। সুমিথিয়ন ৫০ ইসি/লিবাসিড ৫০ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগের মাধ্যমে এ পোকা দমন করা যায়।

ফল সংগ্রহ

চৈত্র-বৈশাখ মাসে গাছে ফুল আসে এবং জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ফল পাকে। সম্পূর্ণ পাকার পর কাপড়ের থলিতে বা গাছের নিচে জাল ধরে শাখায় ঝাঁকুনি দিয়ে ফল সংগ্রহ করা যায়।

আম

স্বাদে, পুষ্টিতে ও গন্ধে আম অতুলনীয়। তাই অনেক ‘ফলের রাজা’ বলা হয়। বাংলাদেশে প্রায় সব জেলাতেই আম উৎপাদন হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, ঠাঁকুরগাঁও, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, যশোর ও রংপুর জেলাতে আম ভাল জন্মে। আম থেকে চাটনি, আচার, আমচুর, আমসত্ত্ব, মোরব্বা, জেলি, জুস তৈরি করা যায়।

আমের জাত

আমের জনপ্রিয় জাত হচ্ছে– গোপালভোগ, ল্যাংড়া, খিরসাপাত, হিমসাগর, ফজলি। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে বারি আম-১, বারি আম-২, বারি আম-৩ (আম্রপালি) ও বারি আম-৪ (হাইব্রীড) উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ জাতগুলো প্রতি বছরই ফল দিয়ে থাকে।

জমি

সুনিকাশযুক্ত, উর্বর দো-আঁশ মাটি আম চাষের জন্য সর্বোত্তম। উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি আম চাষের জন্য উপযোগী। চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল এবং আগাছামুক্ত করে নিতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি

সমতল ভূমিতে বর্গাকার, আতাকার বা ষড়ভুজী পদ্ধতিতে চারা লাগানো যায়। তবে ষড়ভুজী পদ্ধতিতে শতকরা ১৫ বাগ চারা বেশি লাগানো যায়। এক বছর বয়স্ক সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত কলম রোপণ করতে হয়।

রোপণের সময়

বাংলাদেশের জলবায়ুতে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় (মধ্য মে-মধ্য জুলাই) চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। তবে সেচের ব্যবস্থা থাকলে সারা বছরই চারা লাগানো যায়।

রোপনের দূরত্ব

সারি থেকে সারি ৮-১০ মিটার (২৬-৩২ ফুট) ও গাছ থেকে গাছ ৮-১০ মিটার (২৬-৩২ফুট)।

গর্ত তৈরি

গর্তের আকার হতে হবে ১ মিটার চওড়া ও ১ মিটার গভীর।

প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ

সারের নাম	পরিমাণ
জৈব সার	১৮-২২ কেজি
টিএসপি	৪৫০-৫৫০ গ্রাম
এমপি	২০০-৩০০ গ্রাম
জিপসাম	২০০-৩০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	৪০-৬০ গ্রাম

রোপণ
গর্ত ভর্তি করার ১০-১৫ দিন পর গোড়ার মাটি বলসহ গর্তের মাঝখানে লাগাতে হবে। চারা রোপণের পর পানি, খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ
বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রতি গাছের জন্য সারের পরিমাণ হলো–

সারের নাম	গাছের বয়স	হারে	সারের পরিমাণ (গ্রামে)			
উর্ধ্বে	০২-০৪	০৫-০৭	০৮-১০	১১-১৫	১৬-২০	২০-এর
গোবর/কম্পোস্ট, কেজি	১০-১৫	১৬-২০	২১-২৫	২৬-৩০	৩২-৪০	৪১-৫০
ইউরিয়া (গ্রাম)	২৫০	৫০০	৭৫০	১০০০	১৫০০	২০০০
টিএসপি	২৫০	২৫০	৫০০	৫০০	৭৫০	১০০০
এমপি	১০০	২০০	২৫০	৩৫০	৪০০	৫০০
জিপসাম	১০০	২০০	২৫০	৩৫০	৪০০	৫০০
জিঙ্ক সালফেট	১০	১০	১৫	১৫	২০	২৫

এসব সার ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতেহবে। ১ম বার জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় (মধ্য মে-মধ্য জুলাই) মাসে এবং ২য় বার আশ্বিন (মধ্য সেপ্টেম্বর-মধ্য অক্টোবর) মাসে প্রয়োগ করতে হবে। জিপসাম ও জিংক সালফেট এক বছর পর পর প্রয়োগ করলেই চলবে। সার প্রয়োগের পর পরই হালকা সেচ দিতে হবে।

সেচ
চারা গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য ঘন ঘন সেচ দিতে হবে। আমের মুকুল ফোটার শেষ পর্যায়ে এক বার এবং ফল মটর দানার আকৃতি ধারণ পর্যায়ে আবার এক বার পরিবর্তিত বেসিন পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করতে হবে। ফলন্ত গাছে মুকুল বের হবার ৩-৪ মাস আগে থেকে সেচ দেওয়া বন্ধ রাখতে হবে।

ডাল ছাঁটাই
গাছের প্রধান কান্ডটি যাতে সোজাভাবে ১ থেকে ১.৫ মিটার লম্বা হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে গাছের গোড়ার অপ্রয়োজনীয় শাখা কেটে ফেলতে হবে। গাছের ভেতরে যাতে আলো-বাতাস প্রবেশকরতে পারে সেজন্য ভেতরের অপ্রয়োজনীয় ডালপালা, রোগাক্রান্ত, শুকনো, মরা ও দুর্বল শাখাগুলো কেটে ফেলতে হবে। কলমের গাছের বয়স ৪ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মুকুল ভেঙ্গে দিতে হবে।

এনথ্রাকনোজ রোগ
এনথ্রাকনোজ রোগের আক্রমণে গাছের পাতা, কান্ড, মুকুল ও ফলে ধূসর বাদামি রংয়ের দাগ পড়ে। এ রোগে আক্রান্ত মুকুল ঝরে যায়, আমের গাছে কালচে দাগ হয় এবং আম পচে যায়। কুয়াশা, মেঘাচ্ছন্ন ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এ রোগ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে এবং সব মুকুল ঝরে যায়। আমের মৌসুম শেষে গাছে মরা ডালপালা কেটে পুড়ে ফেলতে হবে। কাটা অংশে বর্দোপেস্ট (প্রতি লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম তুঁতে ও ১০০ গ্রাম চুন) লাগাতে হবে। গাছের নিচে ঝরে পড়া পাতা পুড়ে ফেলতে হবে। গাছের মুকুল আসার পর কিন্তু ফুল ফোটার পূর্বে টিল্ট-২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি অথবা ডাইথেন এম-৪৫, ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। আমের আকার মটর দানার মত হলে ২য় বার স্প্রে করতে হবে।
আম গাছের মুকুল আসার সময় প্রতিটি মুকুলে অসংখ্য হপার নিম্ফ দেখা যায়। নিম্ফগুলো মুকুলের রস চোষার ফলে মুকুলের ফুল শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়। আমগাছে মুকুল আসার ১০ দিনের মধ্যে কিন্তু ফুল ফোটার পূর্বেই (পুষ্পমঞ্জরী ছড়ার দৈর্ঘ্য যখন ৫-১০ সে.মি.) একবার এবং এর এক মাস পর আর একবার প্রতি লিটার পানির সাথে ১.০ মি.লি. সিমবুস/ফেনম/বাসুডিন ১০ ইসি অথবা ডেসিস ২.৫ ইসি মিশিয়ে গাছের পাতা, মুকুল ও ডালপালা ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ভোমরা পোকা
আমের ভোমরা পোকার কীড়া আমের গাছের ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খায়। সাধারণত কচি আমের ছিদ্র করে এরা ভিতরে ঢুকে এবং ফল বড় হওয়ার সাথে সাথে ছিদ্রটি বন্ধ হয়ে যায়। এ জন্য বাইরে থেকে আমটি ভাল মনে হলেও ভিতরে কীড়া পাওয়া যায়। আম গাছের মরা ও অপ্রয়োজনীয় শাখা এবং পরগাছা কেটে ফেতে হবে। গাছে ফল আসার ১-২ সপ্তাহ

পর ডায়াজিনন ৬০ ইসিক্ষা লিবাসিড ৫০ ইসি ২ মিলি বা সুমিথিয়ন ৫০ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ২ বার স্প্রে করে ভাল ফল পাওয়া যায়।

আমের মাছি পোকা

আম পাকার সময় স্ত্রী মাছি আমের ত্বক ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। দু'তিন দিনের মধ্যে ডিম ফুটে কীড়া হয় এবং ফলের শাঁস খায়। আক্রান্ত পাকা আম কাটলে অসংখ্য কীড়া দেখা যায় এবং খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যায়। প্রতি লিটার পানির সাথে ডেসস ২.৫ ইসি ১ মিলি হারে মিশিয়ে আম সংগ্রহের এক/দেড় মাস আগে থেকে পাতা ও আম ভিজিয়ে ১৫ দিন পরপর দু'বার স্প্রে করতে হবে অথবা গাছের নিচে বিষটোপ (১০০ গ্রাম পাকা আমের রসের সাথে ১ গ্রাম ডিপটেরেক্স ৮০ এসপি এর মিশ্রণ) ব্যবহার করতে হবে অথবা পাকা আগে বাত্তি আম গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

ফল সংগ্রহ

গাছের কিছু সংখ্যক আমের বোঁটার নিচে ত্বক যখন সামান্য হলুদাভ রঙ ধারণ করে অথবা আধাপাকা আম গাছ থেকে পড়া আরম্ভ করে, তখনই আম সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়। গাছ ঝাঁকি দিয়ে আম না পেরে ছোট গাছে হাত দিয়ে এবং বড় গাছের ক্ষেত্রে জালিযুক্ত বাঁমের কৌটার সাহায্যে আম সংগ্রহ করা ভাল।

কাঁঠাল

বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঁঠাল। বাংলাদেশের সব জেলাতেই কাঁঠারে চাষ হয়। তবে ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, ময়মনসিংহ, মৌলভীবাজার, নরসিংদী, দিনাজপুর ও রংপুর এলাকায় সর্বাধিক পরিমাণ কাঁঠাল উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্য এবং যুক্তরাজ্যে কাঁঠাল এবং কাঁঠালের বীচি রফতানি করছে। যুক্তরাজ্যে রফতানিকৃত কৃষি পণ্যসমূহের মধ্যে কাঁঠালের স্থান দ্বিতীয়। কাঁঠাল প্রচুর শর্কা, আমিশ ও ভিটামিন 'এ' রয়েছে। কাঁচা ফল তরকারি, পাকলে ফল হিসেবে এবং বীজ তরকারি হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

জাত

দেশে কাঁঠালের কোন অনুমোদিত জাত নেই তবে কাঁঠালের কোষের বৈশিষ্ট্য অনুসারে কাঁঠালের তিনভাগে ভাগ করা যায়। তাহলোঃ খাজা, আদরসা ও গালা।

জমি নির্বাচন ও তৈরি

পানি দাঁড়ায় না এমন উঁচু ও মাঝারি উঁচু সুনিষ্কাশিত উর্বর জমি কাঁঠালের জন্য উপযোগী।

রোপন পদ্ধতি

সমতল ভূমিতে বর্গাকার, আয়তাকার বা ষড়ভুজী, পাহাড়ি ভূমিতে কন্টুর পদ্ধতিতে এক বছর বয়স্ক সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত চারা / কলম রোপন করতে হবে।

রোপণের সময়

মধ্য জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য শ্রাবণ (জুন-আগষ্ট) মাস।

রোগের দূরত্ব

চারা থেকে চারা ১২ মিটার (৪০ ফুট) এবং সারি থেকে সারি ১২ মিটার (৪০ ফুট)।

গর্ত তৈরি

গর্তের আকার হবে ১ মি. (৩ ফুট) চওড়া ও ১ মিটার (৩ ফুট) গভীর।

প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ

সারের নাম	পরিমাণ
গোবর/কম্পোস্ট	২৫-৩৫ কেজি
টিএসপি	১৯০-২১০ গ্রাম
এমপি	১৯০-২১০ গ্রাম

গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে চারা/ কলম লাগাতে হবে। রোপনের পরপরই পানি সেচ দিতে হবে।

সার প্রয়োগ

বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রতি গাছের জন্য সারের পরিমাণ নিম্নরূপ–

গাছর বয়স	গোবর/কম্পোস্ট (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমপি (গ্রাম)	জিপমাস (গ্রাম)
৬-১২ মাস	২০-৩০	১৯০-২১০	২৪০-২৬০	২৪০-২৬০	৪০-৬০
১-২ বৎসর	২৫-৩৫	২৯০-৩১০	৩৯০-৪১০	২৪০-২৬০	৬৫-৮৫
২-৩ বৎসর	৩০-৪০	৩৯০-৪১০	৫৪০-৫৬০	৪৪০-৪৬০	৯০-১১০
৪-৫ বৎসর	৪০-৫০	৪৯০-৫২০	৫৯০-৭৭০	৫৪০-৫৬০	১১৫-১৩৫
৬-৭ বৎসর	৪০-৫০	৫৯০-৬১০	৮৪০-৯৬০	৬৪০-৬৬০	১৪০-১৬০
৮-৯ বৎসর	৫০-৫৫	৬৯০-৭২০	৯৯০-১০১০	৭৪০-৭৬০	১৬৫-১৮৫
১০ তদূর্ধ	৫৫-৬০	১০০০-১২০০	১৫০০-১৬০০	১০০০-১২৫০	২০০-৩০০

এসব সার ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় (মধ্য মে-মধ্য জুলাই) মাসে ১ম বার এবং আশ্বিন (মধ্য সেপ্টেম্বর-মধ্য অক্টোবর) মাসে ২য় বার প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পরপরই মাটিতে প্রয়োজনীয় রস না থাকলে অল্প পানি দিতে হবে।

সেচ

চারা / কলমের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য সেচ দেয়া প্রয়োজন। ফল ধরার ১০-১৫ দিন পরপর সেচ প্রয়োগ করলে ফলের আকার ও ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ডাল ছাঁটাই

গাছের প্রধান কান্ডটি যাতে ১.০-১.৫ মিটার সোজাভাবে উঠে সেদিকে লক্ষ রেখে গাছর গোড়ায় বেড়ে উঠা অপ্রয়োজনীয় শাখা/ ডাল কেটে ফেলতে হবে। ফল সংগ্রহের পর ফলের ঝুলন্ত / অবশিষ্ট বোঁটা এবং রোগাক্রান্ত শুকনো ও মরা শাখাগুলো সর্বদাই কেটে ফেলতে হবে। কাটা স্থানে বদোপেস্ট (প্রতি লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম তুঁতের ও ১০০ গ্রাম চুন) এর প্রলেপ দিতে হবে।

কাঁঠাল পচা রোগ

এ রোগের আক্রমণে কচি ফলের গায়ে বাদামি রঙের দাগের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ড় আক্রান্ত ফল গাছ হতে ঝরে পড়ে। গাছের পরিত্যক্ত অংশে এ রাগের জীবাণু বেঁচে থাকে এবং বাতাসের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। গাছের নিচে বাতাসের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। গাছের নিচে ঝরে পড়া পাতা ও ফল পুড়ে ফেলতে হবে। ফলিকুর/ টিল্ট নামক ছত্রাকনাশক ০.০৫% হারে পানিতে মিশিয়ে গাছে ফুল আসার পর হতে ১৫ দিন অন্তর ৩ বার স্প্রে করতে হবে।

মুচি ঝরা রোগ

কাঁঠালের মুচি (স্ত্রী পুষ্পমঞ্জরী) ছোট অবস্থাতেই কালো হয়ে ঝরে পড়ে। পুরুষ পুষ্পমঞ্জুরী স্বাভাবিকভাবেই কালো হয়ে ঝরে পড়ে। মুচি ধরার আগে ও পারি ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার বর্দো-মিশ্রণ অথবা ম্যাকোপ্রেক্সে বা কুপ্রাভিট প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে অথবা ২.৫ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ অথবা রিডোমিল এমজেড-৭৫ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

কান্ডের মাজরা পোকা

পোকা কচি ডাল ও কান্ড ছিদ্র করে সুড়ঙ করে ফেলে। আক্রমণের অন্যতম লক্ষণ হিসেবে গর্তের মুখে পোকার বিষ্ঠা দেখা যায়।

সুচালো লোহার শলাকা গর্তের ভেতর ঢুকিয়ে খুঁচিয়ে গ্রাব অবস্থায় পোকা মারতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে খোঁচানো গর্তের মধ্যে কেরোসিন বা পেট্রোল অথবা ০.০২% ভেপোনা দিয়ে গর্তের মুখ কাদা মাটি বা বর্দোপেস্ট দিয়ে বন্ধ করতে হবে।

ফলের মাজরা পোকা

এই পোকার কীড়া ছোট ফলের মধ্যে ফুটো করে ঢুকে যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে। আক্রান্ত ফল ফলের পুরোটাই পচে যায়।

আক্রান্ত ফলগুলো সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। আক্রমণ দেখার সাথে সাথে সিমবুস/ বাসাথ্রিন ১০ ইসি প্রতি লিটার পানির সাথে ১ মিলি হরে মিশিয়ে অথবা সুমিথিয়ন/ লিবাসিডি ৫০ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফল পাতলাকরণ

ফল কচি থাকতেই ঘন থোকা থেকে ছোট দুর্বলগুলো বেছে ফেলে দিলে বাকিগুলো আকারে বড় হয়।

ফল সংগ্রহ

গাছের সমস্ত ফল এক সাথে পরিপক্ব হয় না। ফল পাকতে সাধারণত ১২০-১৫০ দিন সময় লাগে। ফলের কাটা যখন ক্রমশ চ্যাপ্টা হতে থাকে এবং কাটার অগ্রভাগ কাল রঙ ধারণ করে তখনই ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়। কাঁঠাল সাধারণত জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে সংগ্রহ করা হয়। কোন কোন কাঁঠাল আগাম এবং কোন কোনটি নাবী। অমৌসুমি কাঁঠাল পৌষ-মাঘ মাসে সংগ্রহ করা হয়।

লিচু

পুষ্টিকর এ ফলটি বিশ্বের অন্যতম লোভনীয় ও সুস্বাদু। বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম জেলায় বেশি পরিমাণে লিচু উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৫ হাজার হেক্টর জমিতে লিচুর চাষ হয়। মোট উৎপাদন প্রায় ১৩ হাজার টন। হেক্টরপ্রতি ঃফলন ২.৫-২.৭ মে. টন। লিচু টিনজাত করে সংরক্ষণ করা যায়। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে লিচু চাষের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে এবং রফতানির সুযোগ রয়েছে।

ওষুধিগুণ

বোলতা, বিছে এসব কামড়ালে এর পাতার রস ব্যবহার করা হয়। কাঁশি, পোটব্যাথা, টিউমার এবং গলগন্ডের বৃদ্ধি দমনে লিচু ফল কার্যকর। চর্মরোগের ব্যথায় লিচুর বীজ ব্যবহৃত হয়। পানিতে সিদ্ধ লিচুর শেকড়, বাকল ও ফুল গলার ঘা সারায়। কচি লিচু শিশুদের বসন্ত রোগে এবং বীজ অম্ল ও স্নায়ুবিক যন্ত্রণার ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হয়। বাকল ও শিকড়ের ক্বাথ গড়ম পানিসহ কুলি কররে গলার কষ্ট উপশম হয়।

জাত

বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে চাষকৃত লিচু জাতের মধ্যে বেদনা, বোম্বাই, চায়না-১, মোজফ্ফরপুরী, মঙ্গলবাড়ি, কদমি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি লিচু-১, রাজশাহী অঞ্চলের বারি লিচু-২১ বাংলাদেশের সর্বত্র এবং বারি লিচু-৩ পূর্বাঞ্চলের জন্য অধিক উপযোগী।

জমি নির্বাচন ও তৈরি

নিকাশযুক্ত উর্বন বেলে দো-আঁশ মাটি লিচু চাষের জন্য উত্তম। তবে উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে লিচুর চাষ ভাল হয়। চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল এবং আগাছামুক্ত করে নিতে হবে।

রোপন পদ্ধতি

সমতল ভূমিতে-বগাকার, পাহাড়ি ভূমিতে কন্টুর।

রোপনের সময়

এক বছর বয়স্ক সুস্থ ও সবল গুটি কলমের চারা বাছাই করতে হবে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় (মধ্য মে থেকে মধ্য জুলাই) মাস কলম রোপণের উপযুক্ত সময়।

রোপনের দূরত্ব

সারি থেকে সারি ১০ মি. (৩২ ফুট) ও চারা থেকে চারা ৮ মি. (২৬ ফুট)।

গর্ত তৈরি

গর্তের আকার ১ মি. চওড়া ও ১ মি. গভীর।

প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ

গর্তে কিছুটা পুরাতন লিচু বাগানের মাটি মিশিয়ে দিলে চারার বৃদ্ধি দ্রুত হবে। প্রতি গর্তে টিএসপি ৬০০-৭০০ গ্রাম, এমপি ৩৫০-৪৫০ গ্রাম, জিপসাম ২০০-৩০০ গ্রাম, জিংক সালফেট ৪০-৬০ গ্রাম, জৈব সার ২০-২৫ কেজি প্রয়োগ করতে হবে।

রোপণ

গর্ত ভর্তির ১০-১৫দিন পর চারাটি গোড়ার মাটির বলসহ গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগাতে হবে। চারা রোপণের পর পানি, খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। রোপণের ৬ মাস পড়ে ৩০০-৩৫০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে।

সার প্রয়োগ

সার ৩টি সমান ভাগে ভাগ করে দিতে হবে। প্রথম ভাগ পুষ্পমঞ্জরী বের হওয়ার পর, ২য় ভাগ ফলের আকার মটর দানার সমান হলে এবং ৩য় ভাগ ফল পাকার ২ সপ্তাহ পূর্বের প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের মাত্রা প্রতি বছরই ইউরিয়া, টিএসপি এবং এমপি সারের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১১০ গ্রাম, ৪২৫ গ্রাম এবং ২১০ গ্রাম করে বৃদ্ধি করতে হবে।
একটি পূর্ণ বয়স্ক ফলন্ড় গাছের জন্য বাৎসরিক সারের পরিমাণ হলো- ইউরিয়া ১-২ কেজি,টিএসপি ৩.০-৩.৫ কেজি, এমপি ১.০-২.২ কেজি, জিপসাম ২৪০-২৬০ গ্রাম, জিংক সালফেট ৪০-৬০ গ্রাম, গোবর ১০-১৫ কেজি, ছাই ৭-৮ কেজি।

সেচ

চারা গাছের বৃদ্ধির জন্য ঘন ঘন সেচ দিতে হবে। যদি পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত না হয় তবে ফলন্ড় গাছের বেলায় পূর্ণ ফুল ফোটা অবস্থায় একবার এবং ফল মটর দানার আকৃতি ধারণ পর্যায়ে আর একবার সেচ দিতে হবে।

ডাল ছাঁটাই

পূর্ণ বয়স্ক গাছে পর্যপ্ত আলো বাসাত প্রবেশের জন্য অপ্রয়োজনীয় এবং মরা ও রোগাক্রান্ড় ডালপালা কেটে ফেলতে হবে। কলমের গাছের বয়স ৪ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ড় মুকুল ভেঙ্গে দিতে হবে।

লিচুর মাইট বা মাকড়

এ মাকড়গুলো খুবই ছোট। আক্রান্ড় পাতা কুঁকড়ে বাদামি মখমলের মত হয়ে যায়। গাছ বাড়ে না ও ফল হয় না। দুই থেকে তিন বছর আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে আক্রান্ড় ডালপালা বা ডগা ছাঁটাই এবং ধ্বংস করতে হবে। কেলতেন / নিউরন ২ মিলি হারে প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে নতুন পাতায় দু'বার ১৫ দিন অন্ড়র স্প্রে করতে হবে।

লিচুর ফল ছিদ্রকারী পোকা

ফল পাকার সময় পোকা ফলের বোঁটার কাছে ছিদ্র করে ভেতরে ঢুকে এবং বীজকে আক্রমণ করে। পরে ছিদ্রের মুখে বাদামি রঙের এক প্রকার করাতের গুঁড়ার মত মিহি গুঁড়া উৎপন্ন করে। এতে ফল নষ্ট হয় এবং বাজার মূল্য কমে যায়। ফলের গুটি ধরার পর ১৫ দিন পর পর দু'বার সিমবুস/ফেনম ১০ ইসি ১ মিলি হারে প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহ

ফলের খোসার কাঁটা চ্যাপ্টা হয়ে যখন মসৃণ হয় এবং ফলের গায়ে লালচে বর্ণ ধারণ করে তখন কিছু পাতাসহ ডাল ভেঙ্গে লিচু থোকায় সংগ্রহ করতে হবে।

কুল

স্বাদ ও পুষ্টিমানের বিচারে কুল একটি উৎকৃষ্ট ফল। বাংলাদেশের সব জেলাতেই কুলের চাষ হয়, তবে রাজশাহী, কুমিল্লা, খুলনা, বরিশাল, গাজীপুর, সাতক্ষীরা, নওগাঁ, নাটোর, ময়মনহিংহে উৎকৃষ্ট জাতের কুর বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

ওষুধিগুণ

কুল পুষ্টিমান সমৃদ্ধ একটি ফল। কুলের ফল ও পাতা বাটা বাতের জন্য উপকারী। ফল রক্ত শোধন, রক্ত পরিষ্কার এবং হজমীকারক। শুকনো কুলের গুঁড়ো ও আঁখের গুড় মিশিয়ে চেটে খেলে মেয়েদের সাদস্রাবের কিছুটা উপকার হয।

জাত

কুলের কোন অনুমোদিত জাত নেই। তবে দেশে বেশ কিছু জাত রয়েছে যা কুমিল্লা কুল, সাতক্ষীরা কুল, রাজশাহী কুল, আপেল কুল নামে পরিচিত। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট সম্প্রতি বারি কুল-১ ও বারি কুল-২ নামে দুটি জাত যুক্তায়িত করেছে।

মাটি ও জমি

যে কোন ধরনের মাটিতেই বিশেষ কওে দো-আঁশ মাটিতে কুলের সন্ড়োষজনক ফলন পাওয়া যায়। কুলগাছ লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা উভয়ই সহ্য করতে পারে।

রোপণের সময়
মধ্য জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য আশ্বিন চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

রোপণের দূরত্ব
সারি থেকে সারি ৭ মিটার (২৩ ফুট) এবং চারা থেকে চারা ৬ মিটার (২০ ফুট)।

গর্ত তৈরি
গর্তেও আকার হবে চওড়া ১ মিটার এবং ১ মিটার গভীর।

প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ
চারা রোপণের ১০-১২ দিন আগের যে হাওে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ
পচা গোবর	২০-২৫ কেজি
টিএসপি	২০০-২৫০ গ্রাম
এমপি	২৪৫-২৫৫ গ্রাম

রোপণ
গর্ত ভর্তি কারা ১০-১৫ দিন পর গর্তেও মাঝখানে নির্বাচিত চারাটি সোজাভাবে লাগিয়ে খুঁটি, বেড়া ও পানি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাল ছাঁটাই
প্রতি বছর ফল সংগ্রহের পর ছাঁটাইয়ের সময় শক্ত সমর্থ শাখাগুলো গোড়া থেকে না কেটে কিছু অংশ রেখে আগা কেটে ফলতে হবে। এছাড়া দুর্বল, রোগা ও কীটাক্রান্ড় ঘনভাবে বিন্যাস্ড় ডালগুলো কেটে পাতলা করে দিতে হবে। অতপর নতুন যে ডালপালা গজাবে সে গুলোও বাছাই করে ভাল ডালগুলো রেখে দুর্বল ডাল কেটে ফেলে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ
বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রতিটি গাছের জন্য সারের পরিমাণ হবে–

গাছের বয়স	গোবর(কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি(গ্রাম)	এমপি (গ্রাম)
১-২	১০-১২	২৫০-৩০০	২০০-২৫০	২০০-২৫০
৩-৪	১৫-২০	৩৫০-৫০০	৩০০-৪৫০	৩০০-৪৫০
৫-৬	২১-২৫	৫৫০-৭৫০	৫০০-৭০০	৫০০-৭০০
৭-৮	২৬-৩৫	৮০০-১০০০	৭৫০-৮৫০	৭৫০-৮৫০
৯ ও তদূর্ধ	৩৬-৪৫	১১৫০-১২৫০	৯০০-১০০০	৯০০-১০০০

এসব সার বছরে ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ফুল আসার আগে ও ফল সংগ্রহের পর সার প্রয়োগ করতে হবে। সার দেয়ার পর হাল্কা সেচ দিতে হবে।

সেচ
চারা রোপণের পর প্রয়োজন অনুসারে সেচ দিতে হবে। ফল ধরার পর ১৫ দিন পরপর সেচ দিলে ভাল ফলন পাওয়া যাবে।

পাউডারী মিলডিউ রোগ
গাছের পাতা, ফুল ও কচি ফল পাউডারী মিলডিউ রোগে আক্রান্ত হয় আক্রান্ত ফুল ও ফল গাছ হতে ঝরে পরে। গাছে ফুল দেখা দেয়ার পর থিউভিট নামক ছত্রাক নাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা টিল্ট ২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ফল ছিদ্রকারী পোকা
বয়স্ক পোকা ফলের বোঁটার কাছে ডিম পাড়ে এবং শুককীট ফরৈ সুড়ঙ্গ তৈরি কওে শাঁস খেয়ে ফেলে। এতে ফল খাওয়ার উপযোগী থাকে না। রিপকর্ড/সিমবুস/ফেনম ১০ ইসি ১ মিলি হাওে অথবা সুমিথিয়ন/ম্যালাথিয়ন/লিবাসিড ২ মিলি হাওে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ফল মটর দানার মত হওয়ার পর থেকে প্রতি ১৫ দিন পরপর ২ স্প্রে করতে হবে।

মাছি পোকা

এ পোকার কীড়া পাকা ফলের শাসের মধ্যে ঢুকে শাঁস খেতে খেতে আঁটি পর্যন্ড় পৌঁছে যায় এবং কুল খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যায়। দমনের জন্য অতিরিক্তি পাকার আগে ফল সংগ্রহ করতে হবে। আক্রান্ড় ফল এবং গাছের নিচে পড়া ফল সংগ্রহ কওে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে। প্রতি লিটার পানির সাথে ডেসিস ২.৫ ইসি ১ মিলি হারে মিশিয়ে ফল সংগ্রহের এক থেকে দেড় মাস পূর্বে ১৫ দিন পরপর দু'বার স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহ

মধ্য পৌষ থেকে মধ্য চৈত্র মাসের মধ্যে ফল পাওয়া যায়। ফলের রঙ হাল্কা-সবুজ বা হলদে হলে সংগ্রহ করতে হয়।

আপেল কুল (বাউ কুল-১)

জাতীয় বীজ বোর্ড নতুন উদ্ভাবিত জাতটি বিউ কুল-১ নামে মুক্তায়ন করলেও এটি বাজাওে আপেল কুল নামে বেশী পরিচিত ও অত্যন্ত জনপ্রিয়। বর্তমানে বাজাওে অন্যান্য কুলের চেয়ে ক্রেতাদেও নিকট আপেল কুলের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্রতি কেজি আপেল কুল যেখানে বিক্রি হয় ৮০-১০০ টাকায়, সেখানে অন্যান্য ভাল জাতের কুল বিক্রি হয় ৪০-৫০ টাকায়। এছাড়া উদ্ভাবিত নতুন জাতটির ফলন বেমী এবং রোগ বালাই আক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম। পুষ্টিমান নির্ণয় করে জানা গেছে যে, বাংলাদেশের অন্যান্য সকল কুলের তুলানায় এ কুল বেশী মিষ্টি এবং যতেষ্ট পরিমান ভিটামিন-সি (৬১.৩ মি.গ্রা./১০০ গ্রামে) ও অরগানিক এসিড (০.৫০%) বিদ্যামান। পরিপক্ক কুলের রং আপেলের মত হওয়াতে এটি আপেল কুল নামে পরিচিতি লাভ করে।

বাডিং করা গাছে প্রথম বছরেই ফুল আসে। সেপ্টেম্বর-অক্টোরব মাসে ফুল আসার পর ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী মাসে ফল ধরে। সাধারণতঃ পূর্ণবয়স্ক একটি গাছ থেকে বছওে ১৫০-১৮০ কেজি ফল সংগ্রহ করা যায়, যার মূল্য প্রায় ১৫,০০০/- থেকে ১৮,০০০/- টাকা। এভাবে একটি কৃষকের বাড়িতে চারটি আপেল কুলের গাছ থাকলে বছরে শুধু কুল থেকে ৬০,০০০/- থেকে ৮০,০০০/- আয় করা সম্ভব।

বেল

বাংলাদেশে যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশী ফল রয়েছে তার মধ্যে বেল অন্যতম। রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, গাজীপুর, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর এলাকায় বেলের চাষ বেশি হয়।

ওষুধিগুণ

বেল-এর মধ্যে কম বেশি বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান রয়েছে। বেল কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে ও আমাশয়ে উপকার করে। আধাপাকা সিদ্ধফল আমাশয়ে অধিক কার্যকরী। বেলের শরবত হজমি শক্তি বাড়ায় এবং বলবর্ধক হিসেবে কাজ কলে। বেলের পাতার রস মধুর সাথে মিশিয়ে পান করলে চোখের ছানি ও জ্বালা উপশম হয়। পাতার রস, মধু ও গোল মনিচের গুঁড়ো সমেত পান করলে জন্ডিস রোগ নিরাময় হয়।

জাত

এদেশে ছোট বড় বিভিন্ন আকারের বেল দেখা যায়। তবে অনুমোতিদ কোন জাত নেই।

মাটি

প্রায় সব ধরনের মাটিতেই বেল গাছ জন্মে।

রোপণের সময়

বৈশাখ-আষাঢ় মাস গাছ রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে বর্ষার শেষের দিকে অর্থাৎ ভাদ্র-আশ্বিন মাসেও বেল গাছ লাগানো চলে। অতিরিক্ত বর্ষার চারা রোপণ না করাই ভাল।

রোপণের দূরত্ব

সারি থেকে সারি ৮ মিটার (২৬ ফুট) ও চারা থেকে চারা ৮ মিটার (২৬ ফুট)।

গর্ত তৈরি

গর্তেও আকার ১ মিটার চওড়া ও ১ মিটার গভীর গর্ত তৈরি করতে হবে।

প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ

গর্ত করার ১০-১৫ দিন পর প্রতি গর্তে ১৫-২০ কেজি বৈজ সার, ৫০০ গ্রাম টিএসপি এবং ২৫০ গ্রাম এমপি মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে।

রোপণ

গর্ত ভর্তি করার ১০-১৫ দিন পর গর্তেও মাঝখানে নির্বাচিত চারা সোজাভাবে লাগাতে হবে।

সার প্রয়োগ

বেল গাছে কার প্রয়োগের প্রচল না থাকলেও পূর্ণ বয়স্ক গাছে প্রতি বছর ১৫-২০ কেজি গোবর সার, ১০০০ গ্রাম ইউয়িা, ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ৫০০ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সেচ

চারা রোপণের প্রথমদিকে প্রয়োজনমত সেচ দেয়া দরকার। ফল ধরার পর পানি সেচ দেয়া হলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

ডাল ছাঁটাই

গাছের মরা, রোগাক্রান্ত ও দুর্বল ডালপালা ছাঁটাই করতে হবে।

মরচে পড়া রোগ

কপার জাতীয় ছত্রাক নাশক যেমনঃ কপার অক্সিক্লোরাইড/কুপ্রাভিউ স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

মাইট বা মাকড়

বেল গাছে সচরাচর মাইট পোকা দেখা যায়। আক্রান্ত পাতার উপর চকচকে দাগ দেখা যায়। পাতা কুঁকড়ে বা মুড়ে যায়। আক্রান্ত পাতা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এ পো৷ দমনের জন্য কেলথেন/নিউরণ প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি লিটার হারে মিশিয়ে প্রতি ১৫ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করতে হবে।

ফল ছিদ্রকারী পোকা

ফল ছিদ্রকারী পোকা ফলের কচি অবস্থায় ছিদ্র করে ঢুকে পড়ে এবং ফল পাকা পর্যন্ড় ফলের মধ্যে থাকে। ম্যালাথিয়ন অথবা সুমিথিয়ন প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি মিশিয়ে ফলের কচি অবস্থায় ১৫ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহ

ফুল ধরার সময় থেকে ফল পাকতে প্রায় এক বছর সময় লাগে। চৈত্র মাসের দিকে গাছে ফুল আসে এবং পরের বছর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ফল পাকতে শুরু করে।

কামরাঙা

কামরাঙা বাংলাদেশের একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ফল। দেশের সর্বত্র বাড়ির আঙ্গিনায় দু’একটা গাছ দেখা যায়। গাজীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ঢাকা, সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কামরাঙা বেশ জন্মে। কামরাঙা হতে জেলি, জ্যাম, মোরব্বা, চাটনি, আচার ইত্যাদি প্রস্তুত করা যায়।

ওয়ুধিগুণ

কামরাঙা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ একটি পুষ্টিকর ফল। পাকা ফল রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। ফল এবং পাতা গরম পানিতে সিদ্ধ করে পান করলে বমি বন্ধ হয়। পাতা ও ডগার গুঁড়ো সেবনে জল বসন্ড় ও বক্রকৃমি নিরাময় হয।

মাটি

সুনিকাশযুক্ত দো-আঁশ মাটি কামরাঙা চাষের জন্য উত্তম। তবে যে কোন মাটিতেই এটি জন্মে।

রোপণের সময়

জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ মাস চারা রোপণের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। তবে বর্ষার শেষে চারা রোপণ করা যেতে পারে।

রোপণের দূরত্ব

৬-৭ মিটার (২০-২৩ ফুট) দূরত্বে চারা রোপণ করা যায়।

গর্ত তৈরি
গর্তেও আকার হবে ১ মিটার চওড়া ও ১ মিটার গভীর।

সারের পরিমাণ
প্রতি গর্তে ১৫-২০ কেজি জৈব সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমপি মাটির সাথে ভালভাবে মিশাতে হবে।

চারা রোপণ
বীজ ছাড়াও গুঁটি এবং ভিনিয়ার কলম দ্বারা এর বংশ বি্তার করা যায়। বপনের আগে বীজ সাবান দিয়ে ধুয়ে নিয়ে অংকুরোদগম ভাল হয়। এক বছর বয়সের সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত চারা গর্তেও মাঝকানে সোজাভাবে রোপণ করতে হবে।

ফলন্ত গাছে সার প্রয়োগ
প্রতিটি গাছে ৪০-৫০ কেজি গোবর, ০.৫-১.০ কেজি কওে ইউরিয়া ও এমপি এবং ৩০০-৫০০ গ্রাম টিএসপি প্রয়োগ করে ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। উল্লেখিত সার দু'কিস্তিতে প্রথমবার বর্ষার আগে এবং দ্বিতীয়বার বর্ষার শেষে প্রয়োগ করতে হবে।
সেচ
চারার প্রথম অবস্থায় একমাস নিয়মিত সেচ দিতে হবে। ফল ধরার পর প্রতি ১৫ দিন পরপর ২-৩ বার সেচ দিলে ফল ঝরার মাত্রা করে যাবে এবং ফলন বৃদ্ধি পাবে।

ডাল ছাঁটাই
উল সংগ্রহের পর কামরাঙার গাছে নিয়মিত ডাল ছাঁটাইয়ের দরকার হয় না। মরা, দুর্বল ও রোগাক্রান্ত ডালপালা নিয়মিত কেটে ছেঁটে ফেলতে হবে।

ডাই ব্যাক
পেয়ারার মত দমন করতে হবে।

বোঁটা পচা রোগ
এক প্রকার ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। পরিষ্কার শুষ্ক দিনে ফল সংগ্রহ করতে হবে। সামান্য বোঁটাসহ ফল সংগ্রহ করতে হবে। মাঝে মাঝে ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহ
ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছে ফুল আসে এবং অগ্রহায়ণ-মাঘ মাসে ফল পাকে। কোন কোন গাছ বছওে একাধিকবার ফল দিয়ে থাকে।ফল পুষ্ট, রঙ উজ্জ্বল ও শিরাগুলো পরিপূর্ণ হলে ফল সংগ্রহ করতে হবে।

ডালিম

ডালিম ছোট আকারের গাছ। এটা খুব সুস্বাদু, ফলের তুলনায় এর ভক্ষণযোগ্য অংশ কম। বাংলাদেশের সর্বত্রই বসতবাড়ির আঙ্গিনায় দু'একটা ডালিম গাছ দেখা যায়। তবে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং রংপুর এলাকায় ডালিম বেশি উৎপন্ন হয়।

ওষুধিগুণ
এটি বেশ পুষ্টিকর। ডালিমের রস কুষ্ঠ রোগের উপকারে আসে। গাছের বাকল, পাতা, অপরিপক্ব ফল এবং ফলের খোসার রস পাতলা পায়খানা, আমাশয় ও রক্তক্ষরণ বন্ধ করে।

জাত
বাংলাদেশে ডালিমের কোন অনুমোদিত জাত নেই। ডালিমের বিখ্যাত জাতের মধ্যে স্পেনিস রুবী, ওয়ান্ডারফুল, মাসকেট রেড উল্লেখযোগ্য।

মাটি
বেলে দো-আঁশ বা পলি মাটিতে এটা ভাল হয়। অল্প ক্ষারীয় মাটিতে ডালিমের চাষ করা যায়। জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ মাস চারা রোপণের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। তবে বর্ষার শেষে চারা রোপণ করা যেতে পারে।

রোপণের দূরত্ব

সারি থেকে সারি ৪ মিটার (১৩ ফুট) ও চারা থেকে চারা ৪ মিটার (১৩ ফুট)।

গর্ত তৈরি

গর্তেও আকার হবে ১ মিটার চওড়া ও ১ মিটার গভীর।

গর্ত প্রতি সারের পরিমাণ

প্রতি গর্তে ১০-১৫ কেজি জৈব সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমপি সার মাটির সাথে ভালবাবে মিশাতে হবে।

চারা রোপণ

বীজ ছাড়াও শাখা বা গুটি কলমের দ্বারা এর বংশ বিস্ড়র করা যায়। এক বছর বয়সের সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত চারা বা কলম রোপণ করতে হবে। গর্ত ভর্তিও ১০-১৫ দিন পর গর্তেও মাঝখানে চারা/কলম লাগতে হবে্ চারা রোপণনের পরপরই পানি সেচ দিতে হবে। কমপক্ষে ১৫ দিন পর্যন্ড় মাটিতে রস রাখতে হবে।

সার

ফলন্ত গাছে প্রতি বছর চৈত্র-বৈশাখ মাসে ১০ কেজি জৈব সার, ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০ গ্রাম টিএসপি এবং ৫০০ গ্রাম এমপি প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পরপরই পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

সেচ

ফল ধরার সময় থেকে গাছে নিয়মিত পানি সেচ দিয়ে ফল ঝরা ও ফল ফাঁটা সমস্যা রোধ করা যায়। গাছের চারদিকে মাটির বাঁধ দিয়ে দেয়া ভাল।

ডাল ছাঁটাই

ডালিমের শাকা-প্রশাখা ছাঁটাই করলে অধিক সংখ্যায় নতুন ডালপালা গজায়, এতে ফলন বৃদ্ধি পায়। তদুপরি গাছের মরা, রোগাক্রান্ত, দুর্বল ডালপালা ছেঁটে দিতে হবে।

ডাই ব্যাক

পেয়ারার মত দমন করতে হবে।

এ্যানথ্রাকনোজ

প্রথমে ফলের গায়ে ছোট ছোট বাদামী দাগ পড়ে এবং পরে কালো হয়ে ফল ঝরে পড়ে। আক্রান্ড় ফল সংগ্রহ কওে মাটিতে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেরতে হবে। ফল ধরার পর ডাইথেন এম-৪৫ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হাওে মিশিয়ে অথবা বর্দোমিশ্রণ (১%) ১৫ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে।

ফল ছিদ্রকারী পোকা

এ পোকা ফলের গায়ে ডিম পাড়ে এবং ডিম থেকে উৎপন্ন শুকীট ফলের শাঁস খেয়ে ভেতরের দিকে অগ্রসর হয় এবং পরে মুকটীটে পরিণত হওয়ার পূর্বে ত্বকে গোলাকার ছিদ্র করে বেরিয়ে আসে। আক্রান্ড় ফল খাওয়ার উপযোগী থাকে না। ফল ছোট থাকা অবস্থায় পাতলা কাপড় বা বাদামী কাপড় বা পলিথিন দিয়ে ফল ঢেকে দিতে হবে। ফল ধরার সময় থেকে সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২ মিলি হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ১৫ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহ

ফলের খোসার বর্ণ হলদে-বাদামী হওে ফল সংগ্রহ করতে হবে।

আনারস

বাণিজ্যিক ফল হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে আনারস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আনারস পুষ্টিকর ও সুস্বাদু ফল। সিলেট, মৌলভীবাজার, টাঙ্গাইল (মধুপুর), চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান) ময়মনসিংহ (ভালুকা), নরসিংদী ও পঞ্চগড় এলাকায় আনারস বেশি উৎপাদিত হয়। ঢাকা, নরসিংদী, কুমিল্লা এবং দিনাজপুর জেলাতেও আনারসের চাষ হয়ে থাকে। মৌলভীবাজার, শ্রীমঙ্গল ও টাঙ্গাইলের মধুপুর এলাকায় আনারস একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল।

ওষুধি গুণ

পাকা ফল বলকারক, কফ পিত্ত বর্ধক, পাচক ও ঘর্মকারক। কাঁচা ফল গর্ভপাতকারী। পাকা ফলের সদ্য রসে ব্রোমিলিন নামক এক জাতীয় জারক রস থাকে বলে এটি পরিপাক ক্রিয়ার সহায়ক হয়। কচি ফলের শাঁস ও পাতার রস মধুর সাথে মিশিয়ে সেবন করলে ক্রিমির হাত হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

জাত

বাংলাদেশে মাত্র তিন জাতের আনারস চাষ হয় এগুলো হলো–হানিকুইন, জায়েন্ট কিউ এবং ঘোড়াশাল।

জমি নির্বাচন ও তৈরি

দো–আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি বেশ উপযোগী। মাটি ঝুরঝুরে করে মই দিয়ে জমি সমতল করতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি কোন স্থানে জমে না থাকতে পারে। জমি থেকে ১৫ সে.মি. উঁচু এবং ১ মিটার প্রশস্ত বেড তৈরি করতে হবে। এক বেড থেকে অপর বেডের মেধ্য ৫০-৬০ সে.মি. ফাঁক দিতে হবে।

রোপণ

মধ্য আশ্বিন থেকে মধ্য অগ্রহায়ণ (অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাস) আনারসের চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। তাছাড়া সেচের সুবিধা থাকলে মধ্য মাঘ থেকে মধ্য ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি মাস) পর্যন্ত চারা লাগানো যায়। ১ মিটার প্রশস্ত বেড়ে দু'সারিতে চারা রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সে.মি. এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৩০-৪০ সে.মি. রাখতে হবে।

সারের পরিমাণ

সারের নাম	পরিমাণ/গাছ
পচা গোবর	২৯০-৩১০ গ্রাম
ইউরিয়া	৩০-৩৬ ”
টিএসপি	১০-১৫ ”
এমপি	২৫-৩৫ ”
জিপসাম	১০-১৫ ”

গোবর, জিপসাম ও টিএসপি সার বেড তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ও পটাশ সার চারা রোপণের ৪-৫ মাস পর থেকে শুরু করে ৫ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

সেচ

শুষ্ক মৌসুমে আনারস ক্ষেতে পানি সেচ দেওয়া প্রয়োজন। বর্ষা মৌসুমে অতি বৃষ্টির সময় গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমে না থাকে সেজন্য নালা কেটে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগ বালাই ও প্রতিকার

আনারসসে তেমন কোন মারাত্মক রোগবালাই দেখা যায় না। যে সকল রোবালাই আনারস বাগানে দেখা যায়, প্রতিকার ব্যবস্থাসহ নিচে সেগুলো দেওয়া হলো–

কান্ড পচা রোগ

এ রোগের আক্রমণে পাতার গোড়া পচে যায় এবং দুর্গন্ধ বের হয়। পাতার ডগা টান দিলে গোড়া থেকে উঠে আসে। রোপণের পূর্বে চারার গোড়া বর্দো মিশ্রণে চুবিয়ে নিতে হবে। চারা লাগানোর পূর্বে শতকরা ০.২ ভাগ হারে (১০ লিটার পানিতে ২ গ্রাম রিডোমিল পাউডার) রিডোমিল পানিতে মিশিয়ে ভিজিয়ে দিলে এ রোগের সম্ভাবনা কমে যায়। চারা লাগানোর পর এ রোগ দেখা দিলে রিডোমিল মিশ্রিত পানি আনারস জমিতে প্রয়োগ করে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে।

ফল পচা রোগ

ফলের চোখগুলো প্রথমে পচন শুরু হয় এবং আক্রান্ড় স্থান নরম, রসাল ও কালচে হয়ে যায়। অবশেষে সম্পূর্ণ ফলটা পচে যায়। সংগ্রহীত ফলের বোঁটা ১০% বেনজোইক এসিড দ্রবণে চুবিয়ে নিতে হবে।

ছাতরা পোকা এবং পিঁপড়া

গাছের পাতা, কান্ড প্রভৃতির উপর থেকে রস চুষে খেয়ে সেখান ক্ষত সৃষ্টি করে। এতে আক্রান্ত ফল পচে যায়। মূল বা কান্ডমূলের সংযোগস্থান আক্রান্ত হলে গাছ ঢলে পড়ে। ফাইফানন ৫৭ ইসি দ্রবণ (২.৫ লিটার পানিতে ৮ মিলি লিটার ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি) গাছে স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহ

সাধারণত চারা রোপণের ১৫-১৬ মাস পর মাঘ থেকে মধ্য চৈত্র (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) মাসে আনারস গাছে ফুল আসে এবং জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য ভাদ্র (জুন থেকে আগস্ট) আসে আনারস পাকে।

জলপাই

কাঁচা-পাকা উভয় অবস্থায়ই জলপাই খাওয়া যায়। এর চাটনি ও আচার খুব সুস্বাদু। পাকা ফলে ১৫-৪০% তেল থাকে। বাংলাদেশের সর্বত্রই জলপাই জন্মে থাকে তবে কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, গাজীপুর, টাঙ্গাইল ও রাজশাহী এলাকায় বেশি উৎপন্ন হয়।

ওষুধি গুণ

জলপাই-এর মধ্যে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদন রয়েছে। এর তেলে প্রচুর ভিটামিন ‘এ’ রয়েছে। জলপাইয়ের তেল ম্যাসাজ অয়েল, প্রলেপ ও রোচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

রোপণের সময়

জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ চারা রোপণের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। তবে বর্ষার শেষে চারা রোপণ করা যেতে পারে।

রোপণের দূরত্ব

গারি থেকে সারি ৬ মিটার (২০ ফুট), চারা থেকে চারা ৬ মিটার (২০ ফুট)।

গর্ত তৈরি ও প্রাথমিক সার প্রয়োগ

গর্তের আকার হবে ১ মিটার চওড়া ও ১ মিটার গভীর। প্রতি গর্তে ১০-১৫ কেজি জৈব সার, ২০০ গ্রাম টিএসপি ও ৪ কেজি ছাই গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশাতে হবে।

চারা রোপণ

বীজ ছাড়া শাখা কলম ও গুঁটি কলমের মাধ্যমেও বংশ বিস্তার করা যায়। গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর এক বছর বয়সী সুস্থ কলম গর্তেও সঠিক মাঝকানে লাগতে হবে।

সার প্রয়োগ

চারা রোপণের পর প্রতি বছরই বর্ষার আগের ও পরে ১০০ গ্রাম করে ইউরিয়া ও পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বাড়ার সাথে প্রতি বছরই সারের পরিমাণ ১০% হারে বাড়িয়ে দিতে হবে। ভাল ফলনের জন্য পূর্ণ বয়স্ক গাছের জন্য বছরে ৩০ কেজি জৈব সার, ১ কেজি ইউরিয়া, ১ কেজি টিএসপি ও ১ কেজি এমপি প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

সেচ

সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। শীতকালে ৪-৫ সপ্তাহ ও গরমকালে ২-৩ সপ্তাহ পর পর সেচ দিলে ভাল হয়। ফুল ফল ধরার পর কমপক্ষে দু’বার সেচ দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ

ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফল পাকে। ফল বাত্তি হলে সংগ্রহ করতে হবে।

সেসন- ৮

❖ জৈব সার পরিচিতি ও উৎপাদন

জৈব সারঃ

জীব দেহ ও গাছ পালা হতে প্রাপ্ত সার যা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এবং ফসলের প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান দেয় তাই জৈব সার। যেমন ঃ পচা গোবর, কম্পোষ্ট, পচা আবর্জনা, হাস মুরগরি বিষ্টা, ছাই, কচুরীপানা, ধইঞ্চা, খৈল ইত্যাদি।

জৈব সারের গুরুত্বঃ

- জৈব সার মাটির উর্বরতা বাড়ায়।
- এতে গাছের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল ধরনের খাদ্য উপাদান বিদ্যমান থাকে।
- জৈব সারের কার্যকারিতা মাটিতে অনিক দিন থাকে।
- মাটির গঠন ও গুনগত মান উন্নত করে।
- গাছের শিকড় ও অঙ্গজ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- রাসায়নিক সারের কার্যকারিতা বাড়ায়।
- মাটিতে অনুজীবের কার্যকারিতা বাড়ায়।
- মাটির বিষাক্ততা কমায়।
- ফসলের গুণগতমান এবং সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ায়।

কেঁচো সার একটি উৎকৃষ্ট জৈব সার

বিবিএস ২০০৫, কৃষি পরিসংখ্যান পুস্তিকা, কৃষি মন্ত্রণালয় ২০০৭, সরেজমিন উইং-২০০৯, এর হিসাব অনুযায়ী ১৯৯০-৯১সালে দেশে ব্যবহৃত ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি, এসএসপি, এমওপি, জিপসাম, দস্ড্র, এসএসপি, এবং আরো কিছু রাসায়নিক সার সহ মোট ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের পরিমাণ ছিলো ২১,০৭৫৩৮ (একুশ লাখ সাত হাজার পাঁচশত আটত্রিশ)টন এবং ২০০৭-০৮ সালে ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের মোট পরিমাণ ৪০,৯০,০০০(চল্লিশ লাখ নব্বই হাজার)টন। অর্থ্যাৎ দুই দশকের কম সময়ের মধ্যে দেশে রাসায়নিক সারের ব্যবহার দ্বিগুণ বেড়েছে। রাসায়নিক সার ব্যবহারের প্রধান কারণ উন্নত জাতের অধিক ফলনশীল ধান, গম এবং অন্যান্য দানাদার ও সব্জী ফসলের ব্যাপকহারে চাষবাদ। রাসায়নিক সারের ব্যবহারে স্বল্প মেয়াদে ফসলের উৎপাদন বাড়লেও আমাদের পরিবেশ ও জীব বৈচিত্রের উপর দীর্ঘস্থায়ীভাবে ক্ষতিকর প্রভাব দিন দিন বহুগুণে বেড়েই চলেছে। রাসায়নিক সারের ব্যবহারে জমির পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে; জমিতে বসবাসকারী উপকারী নানা প্রকারের মাইক্রো অর্গানিজম, প্রকৃতির লাঙ্গল বলে পরিচিত কেঁচো, ব্যাঙ, এমনকি স্বাদু পানির উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছ আজ বিলুপ্তির পথে। তাই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটাতে অধিক ফসল উৎপাদনের যেমন বিকল্প নেই তেমনি পরিবেশ ও জীববৈচিত্র রক্ষার্থেও আমাদেরকে নিতে হবে উপযুক্ত পদক্ষেপ। এক্ষেত্রে ফসল চাষে জৈব সারই হতে পারে আমাদের প্রধান হাতিয়ার। গোবর,কমোষ্ট, খামারজাত সার, সবুজ সার, প্রেসমাড নানা রকম জৈব সারের সাথে আমরা পরিচিত। কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বৈজ্ঞানিকেরা নানা রকম পরীক্ষা - নিরীক্ষা করে জার্মানী থেকে কেঁচো এনে আমাদের চাষীদের জন্য উদ্ভাবন করেছেন কেঁচো সার বা ভার্মি কমোষ্ট। ভার্মি কমোষ্টের ব্যবহার সত্যিকার অর্থেই আমাদের বর্তমান কৃষির রুপ বদলে দিতে পারে।

কেঁচো সার বা ভার্মি কমোষ্ট একটি পরিবেশ বান্ধব ও লাগসই জৈব সার। এ সার সকল মাঠ ফসল এবং ফুল, ফল ও শাকসবজিতে ব্যবহার করা যায়। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিসহ এ সার মাটির ভৌতিক, রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলীর উন্নয়ন সাধন করে। এ সার ব্যবহারে রাসায়নিক সারের ব্যবহার শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ড় সাশ্রয় করা সম্ভব। কেঁচো সার তৈরিতে ব্যবহৃত জৈব পদার্শগুলো হলো গোবর/মুরগীর বিষ্ঠা, বায়ো স্লারী, খড়, পচনশীল আবর্জনা, লতাপাতা ইত্যাদি। কেঁচো এগুলো খেয়ে মলত্যাগ করে। এছাড়াও তার দেহ হতে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়। এগুলো জৈব পদার্থের সাথে মিশ্রিত হয়ে পুষ্টিমান বাড়িয়ে দেয়। সকল মিশ্রণ একত্রে একটি উন্নত জৈব সার হিসেবে পরিণত হয়। এ সারকে আমরা কেঁচো সার বা ভার্মি কম্পোষ্ট বলতে পারি।

কেঁচো সার এবং অন্যান্য প্রচলিত জৈব সারের পুষ্টিমানের শতকরা হার এর তুলনা।

জৈব সার	নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশ
কেঁচো সার	২.৫-৩.০	১.০-১.৫	১.৫-২.০
গোবর	০.৫১-১.৫	০.৮-০.৮	০.৫-১.৯

মুরগির বিষ্ঠা	১.৬	১.৫	০.৮৫
কম্পোষ্ট (সাধারণ)	০.৪-০৮	০.৩-০.৬	০.৭-১.০
খামারজাত সার	০.৫-১.৫	০.৪-০.৮	০.৫-১.৯
কম্পোষ্ট (কচুরিপানা)	৩.০	২.০	৩.০
প্রেসমাড	১.০-১.৫	১.৮-২.৪	১.২-৩.৮
বায়োস্লারী (গোবর)	১.২৯	২.৮০	০.৭৫
বায়োস্লারী (মুরগির বিষ্ঠা)	২.৭৩	৩.৩০	০.৮০

কেঁচো সার তৈরীর পদ্ধতি

বর্জ্যসমূহকে (রান্নাঘরের বর্জ্য, পাতা, খড়) মাটির গর্তে ঢেকে রেখে অথবা কালো পলিথিনে মুখ বন্ধ করে বায়ুশূণ্য অবস্থায় ৭/৮ দিন রাখতে হবে। গাঁজন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর উন্মুক্ত স্থানে রেখে শুকিয়ে ৫০-৬০% আর্দ্রতায় আনতে হবে। কাঁচা গোবর ১০-১৫ দিন প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মুক্ত অবস্থায় পঁচাতে হবে। অবশ্যই মনে রাখতে হবে কখনই কাঁচা গোবর সরাসরি মাটির গামলায় দেয়া যাবে না। তাহলে সব কেঁচো মরে যাবে। যেখানে মুরগীর বিষ্ঠা পাওয়া সহজ সেখানে গোবরের পরিবর্তে মুরগীর বিষ্ঠা ব্যবহার করা বেশী লাভজনক হবে।মুরগীর বিষ্ঠাও প্রচলিত পদ্ধতিতে ১০-১৫ দিন পঁচাতে হবে।

পঁচন এবং গাঁজন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে সকল বর্জ্য (গোবর/মুরগীর বিষ্ঠা, রান্নাঘরের বর্জ্য, পাতা, খড়) একত্রে মিশিয়ে ৯টি গামলায় সমানভাবে ভাগ করে প্রতিটিতে ২০০টি করে কেঁচো ছেড়ে দিতে হবে। এরপর ছালার চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে কেঁচো অন্ধকার জায়গায় থাকতে পছন্দ করে এবং অন্ধকারে ভালভাবে খেতে পারে। ২/১ দিন পর পর দেখতে হবে যে গামলায় পানি শুকিয়ে গেছে কিনা। পানি শুকিয়ে গেলে অল্প পানি উপর দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে।

কেঁচো সার তৈরির গামলাগুলোতে কেঁচো দেওয়ার আগেই ঘরের চারদিকে ড্রেন করে পলিথিন বিছিয়ে পানি দেয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। যাতে পিঁপড়া কিংবা অন্যান্য পোকা-মাকড় কেঁচোগুলোকে খেয়ে ফেলতে না পারে। অথবা গামলাগুলোকে বড় জলবিড়া / পানি থাকে এমন পাত্রের উপর বসাতে হবে।

কেঁচো সার সংগ্রহ ঃ

কেঁচো সাধারণত বর্জ্য পদার্থ উপরের দিক থেকে খেতে শুর“ করে। বর্জ্য পদার্থ যখন চা এর গুড়ার মত ঝুরঝুরে হয় তখন বুঝতে হবে সার তৈরি হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে কেঁচোর মল-ই হলো সার যা কাস্ট নামেও পরিচিত। এ অবস্থায় চালুনি দিয়ে ঢেলে কোকুলন (কেঁচোর ডিম) এবং ঝরঝরে অংশ আলাদা করতে হবে। চালুনির ছিদ্র ০.৫ মিলিমিটার হলে ভাল হয়। প্রথম ধাপে কেঁচো সার তৈরি হতে ২০-২৫ দিন সময় লাগে।

১০-১৫% আর্দ্রতাসম্পন্ন অবস্থায় কেঁচো সার সংরক্ষণ করতে হবে। অর্থাৎ ভালভাবে রোদে শুকিয়ে পলিথিনে সীল করে আটকিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। এভাবে সংরক্ষিত কেঁচো সার প্রায় এক বছর পর্যন্ড় ভাল থাকে।

২০-২৫ দিন পর পর সার তৈরি হতে থাকবে। পুনারায় আবর্জনা তৈরি হরে গামলায় কেঁচোগুলোকে ছেড়ে দিলে ২০/২৫ দিনের মধ্যে আবার পরিমাণমত সার সংগ্রহ করা যাবে।

বছর	সারে পরিমাণ	জমির পরিমাণ
১ম বছর	১৫ কেজি	১ শতাংশ
২য় বছর	৭.৫ কেজি	১ শতাংশ
৩য় বছর	৩.৭ কেজি	১ শতাংশ

মাটির অবস্থা মোটামুটি স্বাভাবিক হলে উলে-খিত চার্ট অনুসারে সার ব্যবহার করা যেতে পারে। এর ফলে আশাতীত ফল পাওয়া যাবে। এভাবে কেঁচো কম্পোষ্ট তিন বছর ব্যবহার করলে পরবতী দু'বছর ঐ জমিতে তেমন সার ব্যবহারে প্রয়োজন হবে না। যা প্রকৃত উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনবে। মাটির উর্বরতা যদি একেবারেই না থাকে তাহলে কেঁচো সারের পাশাপাশি প্রথম বছর ৭.০০% রাসায়নিক সার ব্যবহার করা যেতে পারে।

কেঁচো সার তৈরিতে সর্তকতা ঃ

১. পোকামাকড় ও পিঁপড়াসহ অন্যান্য ক্ষতিকর জীবজন্তু কেঁচো খেয়ে কিংবা কেটে ফেলতে পারে।
২. সরাসরি রোদ লাগলে কেঁচো মরে যেতে পারে।
৩. বৃষ্টির পানি গামলায় ঢুকে গেলে কেঁচো মরে যেতে পারে।
৪. বর্জ্য পদার্থের সাথে বালি/মাটি মিশে গেল কেঁচো মরে যেতে পারে।

৫. গামলার মধ্যে সারের উপদানগুলো শক্তভাবে চেপে দিলে কেঁচোগুলো সহজে খেতে পারে না। ফলে সার সঠিকভাবে তৈরি নাও হতে পারে।
৬. সারে গামলার মধ্যে অতিরিক্ত পানি দিলে সার তৈরি বিঘ্নিত হতে পারে।
কেঁচো সারে ব্যবসায়িক সুবিধা
১. কম পুঁজি ও স্বল্প পরিশ্রমে ব্যবসাটি করা যায়।
২. গ্রামীণ মহিলারা নিজ ঘরে বসেই সংসারের অন্যান্য কাজের পাশাপশি ব্যবসাটি করতে পারবেন।
৩. এলাকার কৃষকদের নিকট সার ও কেঁচো উভয়ই বিক্রি করা যাবে।
৪. পোল্ট্রি এবং মাছের খাবার হিসেবেও কেঁচো বিক্রি করা যাবে।
৫. কেঁচোগুলোকে ঠিকমত সংরক্ষণ ও লালন করতে পারলে বছরে কেঁচোর সংখ্যা প্রয় ৬-১০ গুণ বৃদ্ধি পাবে।
৬. দিন দিন ফুল ও শাক-সবজি চাষ বেড়ে চলেছে আর ফুল চাষেল জন্য এ সারের কোন বিকল্প নেই।
৭. কেঁচো সারের ছোট ছোট এন্টারপ্রাইজ করা ব্যবসাকি দিক থেকে লাভজনক।

সেসন-১১

ফল গাছের ক্ষতিকর পতঙ্গ পরিচিতি ঃ

ফল আবাদে সীমিত আকারে প্রয়োজনে কীটনাশক/ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে। কেমিক্যাল ব্যবহারে খেয়াল রাখতে হবে যেন উহা মানুষ/পশুপাখির জন্য তির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। বরং তথায় আইপিএম পদ্ধতি অনুসরণ করে ক্ষতিকারক পোকামাকড়/ রোগবালাই নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে

–ফল বাগানে প্রাথমিক অবস্থায় পোকা সংখ্যায় কম থাকে বিধায় তা সংগ্রহ করে মেরে ফেলাই ভালো।
- আক্রান্তপাতা বা ডাল পালার অংশ ছেঁটে পুড়িয়ে ফেলা উচিত।
- ঠিকমতো চাষ দিয়ে ওলট-পালট করে ১০-১৫ দিন রোদ খাওয়ানো হলে অনেক পোকা ও রোগের জীবাণু ধ্বংস হয়।
- রাতে বিচরণকারী পোকা আলোর ফাঁদ পেতে মেরে ফেলা একটা উত্তম উপায়।
- বাগানের আশপাশে ঝোঁপ-জঙ্গল থাকলে সেখানে রোগ ও পোকার বংশ বৃদ্ধির আড্ডা হয়। কাজেই এসব অংশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলে রোগ পোকার উপদ্রব কমবে।
- সুযোগ থাকলে বাগান ২-৪ দিন পানিতে ডুবিয়ে রাখলেও অনেক পোকা ও রোগ জীবাণু ধ্বংস করা যায়।
- অন্তর্বর্তী (ইন্টার ক্রপ) ফসল আবাদে বাগানে একই জাতীয় ফসল বার বার না ফলিয়ে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধরনের ফসল আবাদ করে ফসল চক্র পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে ফসলের পোকা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।
- ফসল সংগ্রহ শেষে খড় কুটো রেখে আগুন ধরিয়ে দিলে অনেক পোকা ও রোগ জীবাণু ধ্বংস হয়। একই ভাবে মশাল জ্বালিয়ে ফল বৃক্ষের গোড়া ও মোটা ডালের অংশে তাপ দিলে অনেক পোকা ও রোগ জীবাণু ধ্বংস হবে।
- সেক্স ফেরমন ফাঁদ একবার ব্যবহার করে ৬-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত পুরুষ পোকা (মথ) ধ্বংস করে পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পরিবেশ সহায়ক আধুনিক এ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা প্রয়োজন।
- রোগ পোকার উপদ্রব বেশি বাড়লে তা দমনে সঠিক মাত্রায়, সঠিক রোগবালাই নাশক ব্যবহার করে আক্রমণের ব্যাপকতা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

ফল পাতলাকরণ ও ফসল সংগ্রহ :

কলম করা গাছে প্রথম বছর থেকেই ফুল ও ফল ধরতে পারে। তাতে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। এ জন্য ফুল আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ২/১ বছর এগুলো ভেঙে ফেলা উচিত। বয়স্ক গাছে খুব বেশি ফল ধরলে গাছ কাহিল হয়ে পড়ে, ফলের আকার ছোট হয়, ডাল ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য ফল ভর্তি গাছের অপেক্ষাকৃত ছোট ও দুর্বল ফল প্রথম অবস্থায় পেড়ে কমিয়ে ফেলা উচিত। গাছ থেকে ফল সংগ্রহের সময় সাবধান হওয়া দরকার। মোচড় দিয়ে, ডাল ভেঙে অথবা গাছে বা ডালে জোরে ঝাকানি দিয়ে ফল পাড়া ঠিক নয়। এতে গাছের ক্ষত হয়, সংগৃহীত ফলের মান কমে যায়।

ফল ধরা ও ঝরার কারণ ও প্রতিকার :

অত্যাধিক তাপমাত্রা, বাগানের মাটিতে রসের অভাব, জলাবদ্ধতা, অতিমাত্রায় সার প্রয়োগ, খাদ্য ও হরমোন ঘাটতি, রোগ-পোকার আক্রমণ এবং সময় উপযোগী পরিচর্যার অভাবই ফল কম ধরা ও ঝরার প্রধান কারণ। এছাড়া অনুখাদ্য ও হরমোনের ঘাটতির কারণে ফুল-ফল ঝরে। কাজেই ঝরা রোধে গাছে ফুল আসার ১০ দিন আগে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ মিলি. হারে নাফা (এতে আছে প্রধান ও অপ্রধান খাদ্যসহ হরমোন) স্প্রে করা উচিত। এরপর ফুল আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি লিটার

পানিতে ১ মিলি. হারে লিটোসেন (এতে আছে অনুখাদ্য+ হরমোন এবং পরাগায়নে ক্ষত না করার গুণ) ১ মিলি. এগবেন এবং ০.৫ মিলি. ইমিটাফ এ তিনটি একত্রে মিশিয়ে সেপ্র করা প্রয়োজন। ফল ধরা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ৭-১০ দিন ব্যবধানে ২-৩ বার এ সেপ্র অব্যাহত রাখতে হবে। একমাস পর পর প্রতি লি. পানিতে ৪ গ্রাম হারে একবার কুপ্রাভিট (কপার দলীয়) এবং পরের বার প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি.হারে ড্যাট গ্রো (সালফার দলীয়) মিশিয়ে সেপ্র করে গাছকে রোগ মুক্ত করে বাগান নিরাপদ রাখা যায়।

ফুল-ফল ঝরা কমানো এবং ফল ধরতে সহায়তার জন্য গাছে ফুল আসার আগে ২৫ দিনের ব্যবধানে দু'বার প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ফোরা মিশিয়ে গাছ ভালোভাবে সেপ্র করতে হবে। ফল ধরা আরম্ভ হলে তৃতীয় বারের মতো তা দিয়ে সেপ্র কাজ সমাধা করতে হবে। এ সময় ফোরা হরমোনের সঙ্গে মটিভাস (প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি) মিশিয়ে সেপ্র করলে ফল গাছের সুস্বাস্থ্য ফিরবে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তৃতীয় বার শুধু ফ্লোরাসেপ্র করার ২০ দিন পর প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি. লিটোসেন এবং ১ মিলি. মটিভাস মিশিয়ে স্প্রে করলে ভালো ফলন পাওয়া যাবে।

সেসন-১২

হাতে তৈরী বিভিন্ন পতঙ্গনাশক এর পরিচিতি, তৈরীর পদ্ধতি ও ব্যবহার ঃ

জৈব পতঙ্গনাশক ঃ

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, কীটনাশক নির্ভর যে দমন ব্যবস্থা তা পুরোপুরি কার্যকর তো হচ্ছেই না বরং আরও কিছু জটিল পরিস্থিতি আমাদের জন্য তৈরী করছে

- পোকা মাকড়কে কীটনাশক প্রতিরোধী করে তুলছে
- পরিবেশ দুষন হচ্ছে
- মানুষের সাস্থ্যহানী ঘটছে
- খাবারের মধ্যে কীটনাশকের বিষক্রিয়া ঘটছে
- প্রকৃতিতে বিদ্যমান বন্ধু পোকা ধ্বংস হচ্ছে ইত্যাদি।

মেহগনির কীটনাশক ঃ

১ কেজি মেহগনি কুচি কুচি করে কেটে বা পিষে একটি পাত্রে ৫ লিঃ পানির সাথে ভিজিয়ে রাখতে হবে। ৪/৫ দিন পর এই নিযার্স তুলে সুতি কাপড় দিয়ে ছেঁকে এর সঙ্গে ২০ গ্রাম সাবান বা ডিটারজেন্ট গোলানো পানি + ৫ গ্রাম সোহাগা (ফিটকিরি/ এলাম) মিশিয়ে ২০-২৫মিঃ ফুটিয়ে তা ঠান্ডা হলে এর সাথে ৫গুন পানি মিশিয়ে কীটনাশ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
এর ব্যবহারে ধানের মাজরা পোকা, পাতা মোড়ানো রোগ, ঘাস ফড়িং, জাব পোকা, পাতা ছিদ্রকারী পোকা দমনে ভালো কাজ করে। এটি সবজীর পোকা মাকড়, ছত্রাক, ও নানা রোগ দমনে ভালো কাজ করে। কীটনাশক তৈরির পর মেহগনির ফলের বর্জ্য ভালো জৈব সার হিসেবে কাজ করে।

বিষ টোপ ঃ

১০০ গ্রাম পাকা মিষ্টি কুমড়া থেতলিয়ে
+
০.২৫ গ্রাম মিপসিন ৭৫ অথবা সেভিন ৮৫।
+
১০০ মিলি লিটার পানি

পানি মিশিয়ে ছোট একটি মাটির পাত্রে নিয়ে তিনটি খুটির সাহায্যে এমন ভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে বিষটোপের পাত্রটি মাটি থেকে ১.৫ মিটার উঁচুতে থাকে। বিষটোপ তৈরির পর ৩-৪ দিন পর্যন্ড় ব্যবহার করে তা ফেলে দিয়ে নতুন বিটপোন ব্যবহার করতে হবে। Sex Pheromone ওবিষটোপফসলে ১২ মিটার দূরে দূরে স্থাপন করতে হবে। কিউলিওর নামক সেক্স ফেরোমেন পানি ফাদের মাধ্যমে ব্যবহার করে প্রচুর পূরষ মাছি মেরে ফেলা যায়।

সাদা মাছি পোকা/ হপার পোকা দমনে ঃ

- ❖ ৫০ গ্রাম সাবান/ সাবানের গুড়া ১০ লিঃ পানিতে মিশিয়ে পতার নীচে সম্পাহ ২-৩ বার স্প্রে করা।
- ❖ ৫ গ্রাম গুড়া সাবান ১ লিঃ পানিতে মিশিয়ে পাতার নীচে স্প্রে করা।
- ❖ ১ কেজি নিমবীজ (আঠা ভাজা) ২০ লিঃ পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রোখ পানি চউ পাতার নীচে স্প্রে করা।

বর্দো দ্রবন:

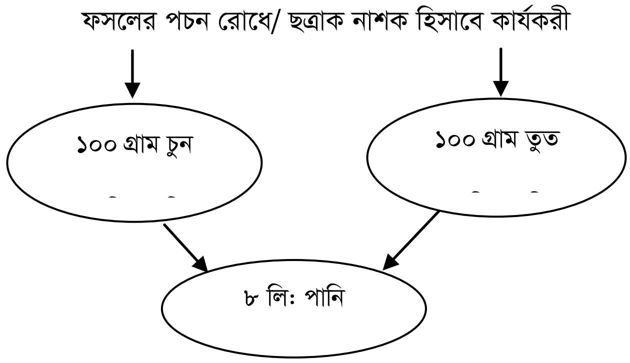

ফারমেন্টেড প্ল্যান্ট জুস ঃ

বর্তমানে ফলের রঙের উজ্জ্বলতা এবং সব্জির আকার, আকৃতি আর্কষণীয় করার জন্য চাষীরা বিভিন্ন রকম রাসায়নিক পদার্থ বিশেষ করে ক্ষতিকর নানা রকম হরমোন হর হামেশাই ব্যবহার করছে। যা প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর; বিশেষ করে শিশুদের জন্য। গবেষণায় দেখা গেছে ক্ষতিকর হরমোন দিয়ে পাঁকানো ফল, প্রিজারভেটিভ দিয়ে সংরক্ষণ করে রাখা সব্জী খেলে কিডনি, লিভার, ফুসফুস রক্ত সংবহনতন্ত্র সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বৈজ্ঞানিকেরা এমন কিছু জৈবিক উপাদান গবেষণার মাধ্যমে বের করেছেন যেগুলোর ব্যবহারে ফল ও ফসলের রঙের উজ্জ্বলতা বাড়ে, দেখতে আর্কষণীয় হয়; ফলে সহজেই ক্রেতার নজরে আসে এবং চাষী অধিক দামে বিক্রি করতে পারে। পক্ষান্ড়রে প্রাকৃতিক এসব উপাদান ব্যবহার করলে মানুষের স্বাস্থ্যের কোন রকম ক্ষতি হয়না। এমনই একটি উপাদান হলো ফারমেন্টেড প-্যান্ট জুস ।

ফারমেন্টেড প্ল্যান্ট জুস ঃ

বিভিন্ন সবুজ গাছ ও ফসলের নরম অংশ বা কচি ডগা হতে বিশেষভাবে সংগৃহীত নির্যাস বা রস হলো ফারমেন্টেড প-্যান্ট জুস (FPJ) যা কৃষকের কাছে ফসলের ভিটামিন নামে পরিচিত। এ নির্যাসে শস্যের বৃদ্ধিজনিত নানা ধরনের হরমোনসহ ফসলের জন্য উপকারী ব্যাকটেরিয়া থাকে ।

ফারমেন্টেড প্ল্যান্ট জুস (FPJ) তৈরীর উপকরণ ঃ

১ ভাগ দানা যুক্ত আখের গুড়, ২ ভাগ সবুজ গাছ ও ফসলের নরম অংশ, ১ টি প্লাস্টিকের বালতি, খবরের কাগজ ও সুতলি।

উপাদান সংগ্রহের সময়ঃ

সূর্য উঠার পূর্বে ইপিল- ইপিল, ধৈঞ্চার ২-৩ টি কচি পাতাসহ ডগার অগ্রভাগ অথবা মাসকলাই বা খেসারীর কচি ডগা অথবা কলা গাছের তেউড় (সাকার) সংগ্রহ করতে হবে। এসব উপাদান ধারালো অস্ত্র দিয়ে ছোট ছোট করে কেটে নিতে হবে। উল্লেখ্য যে সূর্য উঠার পর এসব উপাদান সংগ্রহ করা যাবে না।

ফারমেন্টেড প্ল্যান্ট জুস তৈরীর পদ্ধতি ঃ

- ১কেজি দানা গুড়ের সাথে ২ কেজি পরিমাণ সংগৃহীত ডগা বা তেউড় একটি প্লাস্টিকের বালতিতে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। গুড় এবং গাছের কচি অংশের মিলিত ওজনের সমপরিমাণ কোনো ভারী বস্তু দিয়ে বালতির মধ্যে মিশ্রণকে চাপা দিতে হবে।
- এবার বালতির মুখ খবরের কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে সুতলি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।
- এর পর বালতিটি ছায়াযুক্ত ঠান্ডা কোনো স্থানে যেমন শোয়ার ঘরে চৌকির নিচে রেখে দিতে হবে।
- দ্বিতীয় দিনে একই সময়ে বালতি হতে ওজন সরিয়ে পূর্বের মতো রেখে দিতে হবে।
- ৮-১০ দিন পর বালতি হতে গাছের কচি অংশ সরিয়ে নির্যাস বা রস কোনো খাবার পানির বোতলে ভরে ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। এ রস বা নির্যাসই ফারমেন্টেড প্ল্যান্ট জুস (ঋচঔ) বলে পরিচিত।

ব্যবহারের নিয়ম ঃ

১ভাগ নির্যাসের সাথে ১০০০ (এক হাজার) ভাগ পানি মিশিয়ে বিভিন্ন শাক-সব্জি বা ফসলের ক্ষেতে ফারমেন্টেড প্লান্ট জুস ব্যবহার করা যাবে। এ রস জমি চাষের সময় মাটিতে ব্যবহার করলে মাটির অনুজীবের সংখ্যা ও উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পাবে। শাক-সব্জি বা ফসল অতিদ্রুত মাটি হতে পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করতে পারবে। যেসব শাক-সব্জির ফুল ফলধারণ দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলতে থাকে (যেমন -বেগুন, টেমেটো, শসা ইত্যাদি) সেসব ফসলে বৃদ্ধি পর্যায়ে প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর অন্তর একবার নির্যাস স্প্রে করলে ফলন বৃদ্ধি, সব্জির আকার, আকৃতি এবং ফলের রঙের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।